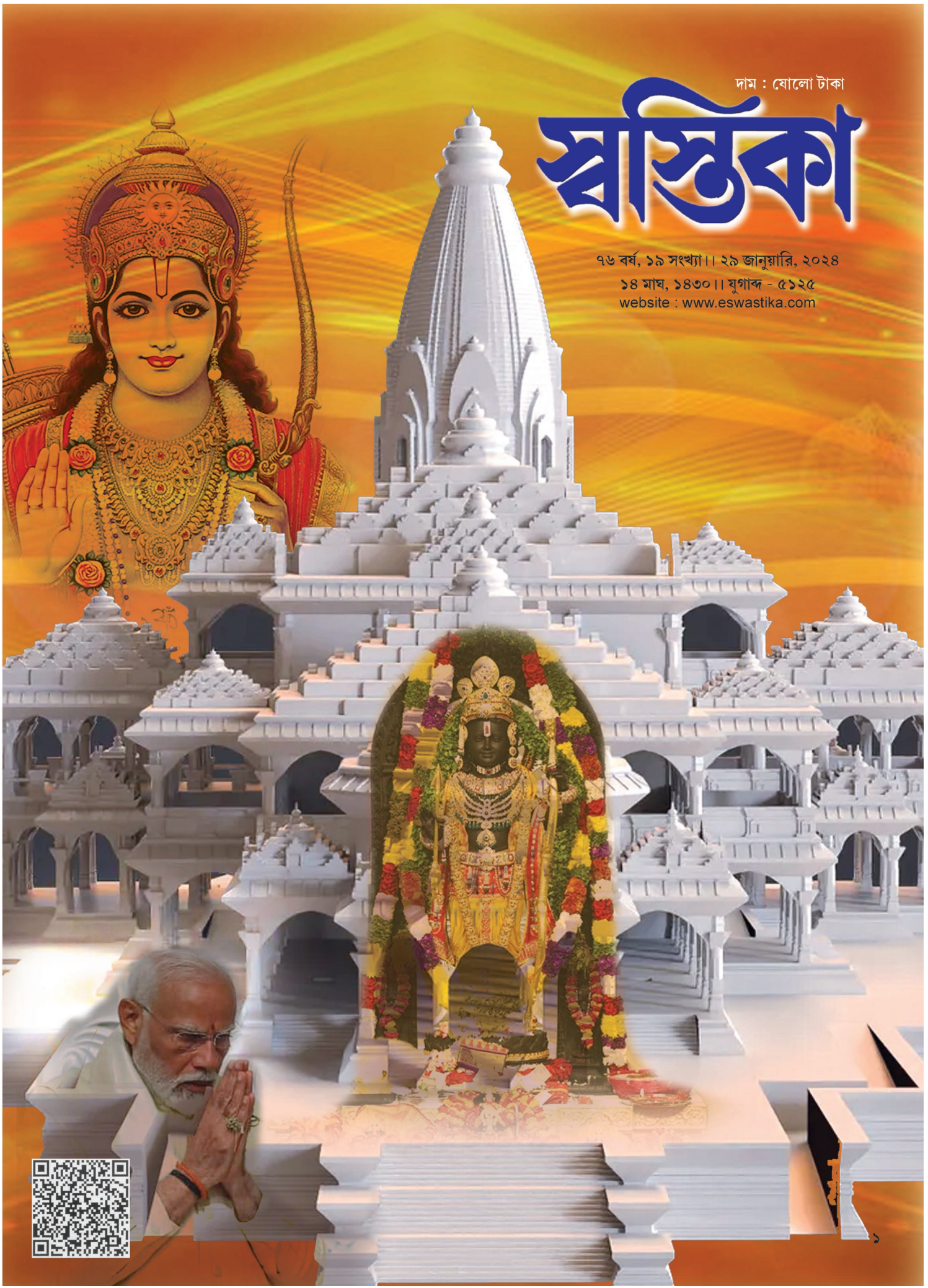

দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

৭৬ বর্ষ, ১৯ সংখ্যা।। ২৯ জানুয়ারি, ২০২৪
১৪ মাঘ, ১৪৩০।। যুগাব্দ - ৫১২৫
website : www.eswastika.com

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৬ বর্ষ ১৯ সংখ্যা, ১৪ মাঘ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

২৯ জানুয়ারি - ২০২৪, যুগাব্দ - ৫১২৫,

Website : www.eswastika.com

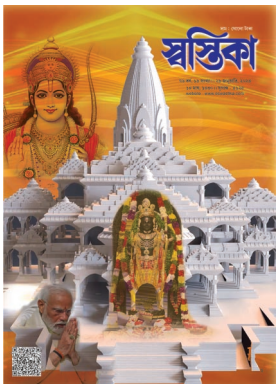

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

'রাম রাষ্ট্র হ্যায়, রাম দেশ হ্যায়' নিরপেক্ষতা মহাপাপ □ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় □ ৬

রামমন্দিরের কড়চা □ বিশ্বামিত্র □ ৭

প্রভু শ্রীরামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা : সংকল্পপূর্তির সঙ্গে এক শুভারম্ভের মাহেন্দ্রক্ষণ □ ড. মনমোহন বৈদ্য □ ৮

ভারতের পুনরুত্থান এবং এককোণে শোচনীয় পশ্চিমবঙ্গ □ ড. রাজলক্ষ্মী বসু □ ১১

ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের দ্বিচারিতার স্বরূপ □ ড. নারায়ণ চক্রবর্তী □ ১৩

শ্রীরামের রাজনীতি ও সুশাসন—ভরতকে রাজনৈতিক কর্তব্যবোধের পাঠ □ সাধন কুমার পাল □ ১৬

অযোধ্যা রামমন্দির—ভারতবাসীর অস্মিতা প্রতিষ্ঠা □ অধ্যাপক দেবাশিস চট্টোপাধ্যায় □ ১৮

মোদী সরকার কৃষকের প্রকৃত বন্ধু □ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী □ ১৯

পশ্চিমবঙ্গেও রাম-লহর □ ২৩

শ্রীরাম জন্মভূমি মন্দিরের প্রাণপ্রতিষ্ঠা—একটি বার্তা □ শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী □ ২৪

রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার মহোৎসবে নক্ষত্র সমাবেশ □ ৩০

শ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারীর শিষ্য শ্রীতারানন্দ ব্রহ্মচারী প্রতিষ্ঠিত প্রেম মন্দির আশ্রম □ কল্যাণ গৌতম □ ৩১

ভাষাসাধক হরিনাথ দে □ শেখর সেনগুপ্ত □ ৩৩

দেশের মানুষের জীবনে মৌলিক পরিবর্তন এনেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী □ সুদীপ্ত গুহ □ ৩৫

অয়োধ্যায় শ্রীরামমন্দিরের পুনঃপ্রতিষ্ঠা রাষ্ট্রীয় গৌরবের প্রতীক □ ডাঃ মোহন ভাগবত □ ৩৮

মোদী সরকারের লক্ষ্য বিকশিত ভারত : কৃষিতে স্বয়ম্ভরতা অর্জন শুধু সময়ের অপেক্ষা □ সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী □ ৪৩

কমিউনিস্টদের আর একটি কলঙ্কময় অধ্যায়— অপারেশান মরিচঝাঁপি □ গোপাল চক্রবর্তী □ ৪৪

বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যৎ ভারতের সম্ভাব্য রূপরেখা □ ড. দেবপ্রসাদ চৌধুরী □ ৪৮

নিয়মিত বিভাগ :

নবাঙ্কুর : ৪০-৪১

প্রকাশিত হবে
৫ ফেব্রুয়ারি,
২০২৪

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
৫ ফেব্রুয়ারি,
২০২৪

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

রাম-বিরোধীরা দেশ-বিরোধী

অযোধ্যায় শ্রীরামমন্দিরের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সুষ্ঠুভাবে মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়েছে। কোটি কোটি মানুষ উল্লসিত হয়েছেন। কিন্তু এরই মধ্যে রাম-বিরোধিতার ছবিও ফুটে উঠেছে। রাম-বিরোধী তথা হিন্দুত্ব-বিরোধী স্ব-ঘোষিত নেতারা এই মহতী অনুষ্ঠান থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখে নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ সিদ্ধ করতে চেষ্টা করেছেন। রাম ও রামমন্দির পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করে যুক্তি সাজিয়েছেন। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় তাদের মুখোশ খুলে দেওয়ার চেষ্টা হবে।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693
IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

পুনঃপ্রতিষ্ঠিত রামলালা

পাঁচশত বৎসরের নিরন্তর সংগ্রামের পরিসমাপ্তি হইয়া জয় ঘোষিত হইল। অযোধ্যায় শ্রীরামমন্দিরের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইয়া রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার কার্যটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইল। বিশ্ববাসী দেখিল অযোধ্যা হইতে আমেরিকা পর্যন্ত রামনামের এক মহা প্লাবন। কিন্তু রামলালাকে তাঁহার মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিতে কম সংঘর্ষ করিতে হয় নাই। পাঠান-মোগলের শাসনকালে সংঘর্ষের তবু যৌক্তিকতা ছিল। তাহারা বিধর্মী। ভারতবর্ষে হিন্দুত্বের বিনাশসাধনই তাহাদের লক্ষ্য। তাই মন্দির পুনরুদ্ধারে তাহাদের সহিত দীর্ঘ সংগ্রাম হইয়াছে। লক্ষ লক্ষ রামভক্তকে প্রাণ বলিদান দিতে হইয়াছে। ধূর্ত ইংরাজ তাহাদের শাসনকালে বিভেদনীতি অবলম্বন করিয়া মন্দির পুনরুদ্ধারের প্রয়াসকে সফল হইতে দেয় নাই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হইল, স্বাধীন ভারতে কংগ্রেস সরকার মন্দির পুনরুদ্ধারের প্রয়াসকে শুধু হতোদ্যমই করে নাই, বাবরি অ্যাকশন কমিটি গঠনে উৎসাহ প্রদান করিয়া সংঘর্ষের পথও প্রস্তুত করিয়াছে। আদালতে এফিডেফিট দাখিল করিয়া তাহারা শ্রীরামের অস্তিত্বকে অস্বীকার করিয়াছে। উত্তরপ্রদেশের মুলায়ম সিংহ সরকার গুলি চালাইয়া রামভক্তদের হত্যা করিতেও দ্বিধা করে নাই। তাহাদের দোসর কমিউনিস্টরা রামমন্দির পুনরুদ্ধার আন্দোলনের বিরোধিতা করিয়া পদে পদে রামভক্তদের লাঞ্ছনা করিয়াছে। তাহা সত্ত্বেও দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ে ২০১৯ সালের ৯ নভেম্বর হিন্দুরা রামমন্দিরের অধিকার লাভ করিয়াছে। দেশের শীর্ষ আদালতের নির্দেশে শ্রীরামজন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ন্যাস গঠিত হইয়া মন্দির নির্মাণের কার্যটি সুষ্ঠুভাবে চালাইয়াছে। মন্দির নির্মাণকল্পে রামভক্তগণ দেশের সর্বশ্রেণীর মানুষের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। গত ২২ জানুয়ারি সাড়ম্বরে নবনির্মিত মন্দিরে রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ইহার পূর্বে শ্রীরামজন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ন্যাসের পক্ষ হইতে রামভক্তগণ দেশের প্রতিটি পরিবারে আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন। দেশের সমস্ত রাজনৈতিক শীর্ষনেতৃত্বকে যেমন আমন্ত্রণ জানানো হইয়াছে, সেইরূপ সমস্ত মত-পথ-সম্প্রদায়ের ধর্মগুরুদিগকেও আমন্ত্রণ জানানো হইয়াছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় হইল, কংগ্রেস-সহ 'ইন্ডি' জোটের দলগুলি পুনরায় তাহার বিরোধিতা করিয়া সেই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, তাহারা দুই-একজন সাধুকেও বিরোধিতায় শামিল করিয়াছে। তাঁহারা প্রশ্ন তুলিয়াছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কেন মন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটন করিবেন? রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা নাকি শাস্ত্রসম্মতভাবে হইতেছে না। কংগ্রেস নেতা দিগ্‌বিজয় সিংহ মানুষকে বিভ্রান্ত করিতেছেন এই বলিয়া যে, মন্দির নির্দিষ্ট স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তিন কিলোমিটার দূরে হইয়াছে। অর্থাৎ স্বাধীন ভারতেও ইহারা মোগল-পাঠান-ইংরাজদের ন্যায়ই আচরণ করিতেছেন।

কিন্তু শত বিরোধিতা সত্ত্বেও শ্রীরামমন্দির পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়া ভারতে রামরাজ্যের সূচনা হইয়াছে তাহাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নাই। নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াই দেশে সুশাসনের পথ প্রশস্ত করিয়াছেন। দেশের সর্বস্তরে তিনি উন্নয়নের জোয়ার আনয়ন করিয়াছেন। দরিদ্র মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করিয়াছেন। স্বাধীনতার সাত দশক পর দেশবাসী সুশাসনের স্বাদ পাইয়াছেন। ইহা ক্ষমতাসীন মোদী সরকারের কথা নহে; ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড, বিশ্বব্যাংক, রাষ্ট্রসঙ্ঘ, বিশ্বের তাবড় তাবড় দেশ তাহা উচ্চকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছে। রাজনৈতিক বিরোধীরা শ্রীরামমন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটনে প্রধানমন্ত্রীর অধিকার লইয়া প্রশ্ন তুলিয়াছেন। হ্যাঁ, প্রধানমন্ত্রীর নিশ্চিত সেই অধিকার রহিয়াছে। স্বাধীন ভারতে সুশাসন অর্থাৎ রামরাজ্যের প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত সংবিধান প্রণেতাগণই দিয়াছেন। মূল সংবিধানের প্রস্তাবনার পূর্বের পৃষ্ঠায় শ্রীরামের চিত্রাঙ্কন তাহাই প্রমাণ করিতেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সেই ইঙ্গিত হৃদয়ঙ্গম করিয়া সেইরূপে শাসন পরিচালনা করিতেছেন। তিনি প্রকৃত রামভক্ত। প্রাণপ্রতিষ্ঠার পূর্বে একাদশ দিবসব্যাপী কঠোর ব্রত পালন করিয়া নিজেকে প্রস্তুত করিয়াছেন। তাঁহার নিকট শ্রীরাম রাজনৈতিক বিষয় নহে। শ্রীরাম ভারতের রাষ্ট্রপুরুষ। শ্রীরামকে যাহারা অস্বীকার করেন তাহারা শুধু রাজনীতিই করিতেছেন, ভারতাত্মার সন্ধান পান নাই। নরেন্দ্র মোদী রাষ্ট্রভক্ত, তাই তিনিই রাষ্ট্রপুরুষকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। দেশের কোটি কোটি রামভক্ত তাঁহার সঙ্গে রহিয়াছেন। তাহাদের আশীর্বাদ তাঁহার মাথায় রহিয়াছে। তাঁহার নিকট শ্রীরামমন্দিরের পুনর্নির্মাণ শুধু কোনো একটি মন্দির নির্মাণ নহে, তাহা রামরাজ্য অর্থাৎ সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এক নিশ্চিত পদক্ষেপ।

সুভাষিতম্

সুবর্ণপুষ্পাং পৃথিবীং চিন্বন্তি পুরুষাস্ত্রয়ঃ।
শূরশ্চ কৃতবিদ্যশ্চ যশ্চ জানাতি সেবিতুম।। (বিদুরনীতি)

কৃতবিদ্য, পরাক্রমী এবং যিনি সেবা করতে জানেন— এরকম তিন ব্যক্তিই এই পৃথিবী থেকে স্বর্ণপুষ্প চয়ন করতে পারেন।

‘রাম রাষ্ট্র হ্যায়, রাম দেশ হ্যায়’
নিরপেক্ষতা মহাপাপ

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

সাধারণভাবে সাংবাদিকদের জন্যই কথাটি প্রযোজ্য। তবে এই রাজ্যে এই মুহূর্তে তা অর্থহীন। কারণ দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এখন কোনো সাংবাদিক নিরপেক্ষ থাকলে মানুষ তাকে ‘দালাল’ বলবেন। ওটা রক্ষা করা মহাপাপ। সংখ্যালঘু ভোটের জন্য লালায়িত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি তাঁর ‘অশুভ সংকেত’ গ্রন্থে আজগুবি দাবি করেছেন, ভারতে মুসলিম জনসংখ্যা ২৬ শতাংশ আর ধর্মীয় সুড়সুড়ি দিলে রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করা উচিত। তাহলে সবার আগে তৃণমূলকেই নিষিদ্ধ করতে হয়।

বঙ্গীয় শব্দকোষ বলছে, নিরপেক্ষতা হচ্ছে একটি ‘আশারহিত’, ‘আশাশূন্য’ আর ‘অভিপ্রায়হীন’ ধারণা। ধর্মনিরপেক্ষতা সেরকম একটি ধারণা। ভারতীয় সংবিধানের বহু দুর্বলতার এটি সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ। সংবিধান তৈরির ২৬ বছর পর ১৯৭৬ সালে অনেকটা গায়ের জোরে প্রস্তাবনায় তা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। গোদের উপর বিষফোঁড়া সমাজতান্ত্রিক ধারণাটিরও। পৃথিবীজুড়ে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ায় ভারতেও তা গলাধাক্কা খেয়েছে। কেরালা বাদে সব রাজ্যে তা অস্তিত্বহীন। পুরোনো ধারণা বাতিল করে চীনা সরকার চৈনিক সমাজতন্ত্র চালু করেছে। ভারতের সাংস্কৃতিক আর রাজনৈতিক কাঠামোর জন্য একেবারেই বেমানান সংবিধানের প্রস্তাবনায় ঢুকিয়ে দেওয়া এই দুটি অসার আর নিরর্থক শব্দ।

বহু ধর্মের দেশ ভারত। সেখানে রাষ্ট্র কীভাবে নিরপেক্ষ হবে তা ভুতুড়ে বলেই মনে হয়। অনেকের দাবি, বহু ধর্মের দেশ বলেই দেশকে নিরপেক্ষ থাকতে হবে। মানে জলে নামব, জল ছড়াব কিন্তু জলকে ছোঁবো না। যেমন বেণী তেমনি রবে, চুল ভেজাব না। ব্যাপারটা হাস্যকর আর উদ্ভট। যুক্তি দিয়ে বুঝতে যাওয়া মুশকিল। তাছাড়া তার কোনো দিকনির্দেশ সংবিধানে নেই। অথচ এই ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটির ছুঁতো ধরে হাতি গলে যাচ্ছে। যার বড়ো উদাহরণ পশ্চিমবঙ্গ। এই রাজ্যে বিভিন্ন ধরনের দেশ বিরোধী আর জিহাদি শক্তির ‘দবদবা’ রোজ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিদেশে অর্থ পাচার থেকে শুরু করে শাসক প্রতিনিধিরা চুরি, সংসদীয় সম্পত্তি বিসর্জন দিয়ে দেশবিরোধী কাজ করছে। ধর্মনিরপেক্ষ কথাটির সুযোগ নিয়ে কেউ ফেরার হয়ে যাচ্ছে। কেউ অর্থের বিনিময় দেশের গোপনীয়তা বিক্রি করছে কিংবা ভারতের দেব-দেবী নিয়ে বিদেশি মশকরাতে মদত দিচ্ছে।

‘ধর্মনিরপেক্ষ’ কথাটি মমতার কাছে কষ্টিপাথরের মতো। পাথর ঘষে তিনি সংখ্যালঘু ভোটের রস নিঙড়ে বের করেন। তাদের তিনি দুধেল গাই বলেন। তার প্রাণভোমরা আর পাখির চোখ ১২৮টি সংখ্যালঘু আসন। বিদেশি জিহাদি বামেরাও তাই ছিল। প্রথম ইরাক যুদ্ধের সময় ‘উদ্দাম সাদ্দাম’ পোস্টার রাজ্যের বুকে ছড়িয়ে দিয়েছিল। ভয়ে তসলিমা নাসরিনকে রাজ্য ছাড়া করেছিল। ধর্মনিরপেক্ষ কথাটি মমতার ঢাল। তবে সমাজতান্ত্রিক কথাটি তিনি কবর দিতে চান। ৩৪ বছর ধরে সমাজতন্ত্রের নগ্নরূপ এ রাজ্যে মানুষ দেখেছেন। সিপিএমকে তিনি দুষ্কৃতীর দল বলেন। অযোধ্যায় রামমন্দির পুনঃপ্রতিষ্ঠার দিনই মমতা সংহতি মিছিল করেন। বিদেশি হানাদার বাবরের স্মৃতিসৌধ ধ্বংসের পঁচিশ বছর স্মরণে মমতা সংহতি দিবস পালন করেছিলেন। জাতীয় নায়ক মর্যাদাপুরুষোত্তম রামলালার মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন তিনি সংহতি মিছিল করে ঘুরিয়ে নাক দেখাচ্ছেন তিনি ধর্ম আর জিরাফ দুটোতেই আছেন। উদ্দেশ্য, রাজ্যের মুসলমানদের মধ্যে ৩২ বছর আগের স্মৃতি উসকে দেওয়া আর তার সঙ্গে তাদের মানসিকভাবে সঙ্গে নেওয়া যাতে আসন্ন লোকসভা ভোটে তাদের ভোট কুক্ষিগত করা যায়।

> “মমতা নিরপেক্ষ নন। ভোটের জন্য তিনি হিন্দু বিরোধী সাজেন যদিও হিন্দুদের বহু আচার তিনি ত্রুটিপূর্ণভাবে পালন করেন। এই ধারণা মানুষের মধ্যে তৈরি হয়েছে। যেমন তৈরি হয়েছে তিনি দুষ্কৃতী আর সমাজবিরোধী পালন করেন।”

তবে এবার মনে হয় মমতার সে গুড়ে বালি পড়তে পারে। মমতা নিরপেক্ষ নন। ভোটের জন্য তিনি হিন্দু বিরোধী সাজেন যদিও হিন্দুদের বহু আচার তিনি পালন করেন। তার বেশিরভাগটাই থাকে ত্রুটিপূর্ণ। এই ধারণা মানুষের মধ্যে তৈরি হয়েছে। যেমন তৈরি হয়েছে তিনি দুষ্কৃতী আর সমাজবিরোধী পালন করেন। মমতাকে মিডিয়াম করে রাজ্যকে দুটো ভূতে ধরেছে—দুষ্কৃতী আর দুধেল গাই। তাই ভূত তাড়াতে নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে রাজ্যের মানুষ বলছেন ‘রাম নাম সত্য হয়। রাম রাষ্ট্র হ্যায়। রাম দেশ হ্যায়। রাম কাল হ্যায়। রাম নীতি হ্যায়। রাম বিজয় হ্যায়। রাম বিনয় হ্যায়।’ রামরাজ্য গঠন এখন কেবল সময়ের অপেক্ষা। □

রামমন্দিরের কড়চা

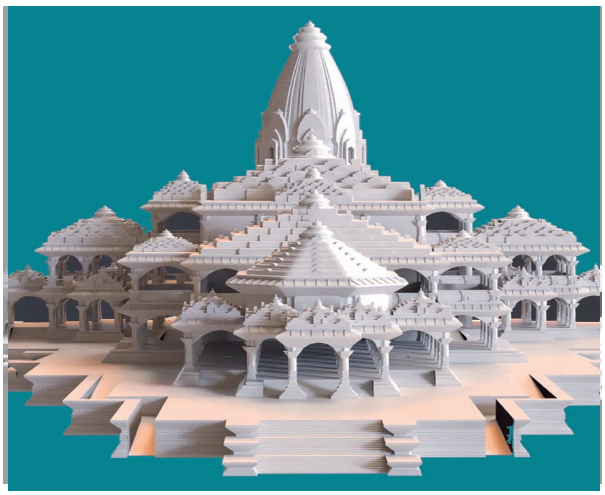

রামমন্দির নির্মাণ

কর্ণাটকের চিক্কাবল্লপুর, সদরহল্লি, দেবানাহল্লি, অন্ধ্র ও তেলঙ্গানার ওয়ারাঙ্গল ও করিমনগর থেকে রামমন্দিরের পাথর গিয়েছে অযোধ্যায়। রাজস্থানের মাকরানা পাথর দিয়ে মেঝে তৈরি হয়েছে। দেওয়ালে ব্যবহার হয়েছে বায়ানা স্যান্ডস্টোন। পাথরে পাথরে ইন্টারলকিং পদ্ধতিতে তৈরি এই মন্দির। বলা হচ্ছে যে, এটির স্থায়িত্ব হবে হাজার বছর। অযোধ্যার রামমন্দির কমপ্লেক্সের নীচতলায় রয়েছে পাঁচটি কাঠামো এবং গর্ভগৃহ। এখানেই রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে আচার-অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো। মোট ৭০ একর জমি জুড়ে তৈরি হয়েছে এই রামমন্দির কমপ্লেক্স। রামলালাকে দর্শন করতে যাওয়া ভক্তদের মন্দিরে প্রবেশ করতে হলে প্রথমে বাইরের প্রাচীর অতিক্রম করতে হবে। এই প্রাচীরই মূল কাঠামোকে ঘিরে রয়েছে। ৭৯৫ মিটারের 'পারকোটা'-র ভিতরে পাঁচটি মন্দির এবং গর্ভগৃহ রয়েছে। সেখানেই রামলালার মূল মূর্তি থাকবে এবং ভক্তরা পরিক্রমা করতে পারবেন।

রামমন্দিরের উপগ্রহ চিত্র

ভারতের নিজস্ব রিমোট সেন্সিং প্রযুক্তির মাধ্যমে এই ছবি তুলেছে ইসরো। প্রায় ২.৭ একর জায়গার উপর তৈরি করা হয়েছে রামমন্দির। সেই রামমন্দিরের ছবিই ভেসে উঠেছে ইসরোর সাইটে। এদিকে গত বছরের ১৬ ডিসেম্বর শেষবার নির্মীয়মাণ রামমন্দিরের ছবি মহাকাশ থেকে তুলেছিল ইসরো। কিন্তু তারপর থেকেই ঘন কুয়াশায় ঢাকা রয়েছে অযোধ্যার আকাশ। তার জেরে দৃশ্যমানতা ক্রমশ কমছে। সে কারণে ছবি তোলাটা ক্রমশ কষ্টকর হয়ে উঠেছে।

ভারতের ৫০টি উপগ্রহ রয়েছে মহাকাশে। হায়দরাবাদের ন্যাশনাল রিমোট সেন্সিং সেন্টার এই ছবিগুলো প্রসেসিং করে। এটা ইসরোর একটা অংশ বলেই পরিচিত। মহাকাশ থেকে বোঝা যাচ্ছে রামমন্দিরকে। সেই ছবি দেখে অভিভূত অনেকেই। সেই ছবিতে সরযূ নদী, অযোধ্যার রেলস্টেশন ফুটে উঠেছে।

উদ্বোধনের মেনু

বিভিন্ন রাজ্যের ভক্তদের জন্য ভাণ্ডারা এবং ওপেন ফুড কোর্টের মাধ্যমে পঞ্চাশ রকম সুস্বাদু ব্যঞ্জন বিতরণ করা হলো। ভক্তদের জন্য অয়োধ্যার বিভিন্ন রাজ্যের সুস্বাদু খাবারের মধ্যে বিহারের লিট্টি-চোখা, রাজস্থানি ডাল-বাটি-চুরমা, পঞ্জাপি তড়কা, দক্ষিণ ভারতীয় ইডলি, মশলা ধোসার সঙ্গে বাঙ্গালি মেনুও খাবারের তালিকায় শামিল করা হয়েছিল। মেনুতে ছিল বাঙ্গালির প্রাণের রসগোল্লা। উত্তরপ্রদেশ, পঞ্জাব, দক্ষিণ ভারত, পশ্চিমবঙ্গ, রাজস্থান, মহারাষ্ট্রর মতো আলাদা আলাদা রাজ্যের জন্য আলাদা আলাদা ফুড কোর্ট বানানো হয়েছিল। যেখানে অতিথিরা নিজেদের পছন্দমত স্টলে গিয়ে আলাদা আলাদা ভাবে খাবার বেছে নিতে পেরেছেন। আয়োজিত এই ভাণ্ডারায় বিশেষ ফল, লাউয়ের রুটি এবং সাবুদানারপ ক্ষীরও মেনুতে রাখা হয়েছে। এই বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে দিল্লি থেকে একটি বিশেষ মেশিন আনা হয়েছিল। যাতে একবারে দশ হাজার ইডলি বানানো সম্ভব হয়েছে।

সাড়ে তিন দশক আগেই ভবিষ্যদ্‌বাণী

আশ্রমের মহন্ত শ্যামসুন্দর দাসের বক্তব্য, প্রায় ৩৩ বছর আগে রামমন্দির নির্মাণ যে হবে, তা জানিয়েছিলেন দেওরাহ বাবা। তিনি বলেন, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতা অশোক সিংঘল প্রায় বাবার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। তিন দশক আগে তাঁরই উদ্যোগে এলাহাবাদে দেওরাহা বাবার একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই সভায় সমস্ত শঙ্করাচার্য উপস্থিত ছিলেন।

রামমন্দির তৈরির ইচ্ছা যে পূরণ হবে, সেই সময় বাবা বলেছিলেন বলে দাবি করেছেন মহন্ত। হিন্দু-মুসলমান মিলেই মন্দির তৈরির কাজ সম্পন্ন হবে বলে জানিয়েছিলেন দেওরাহা বাবা। □

অতিথি কলম

ড. মনমোহন বৈদ্য

প্রভু শ্রীরামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা

সংকল্পপূর্তির সঙ্গে এক শুভারম্ভের মাহেন্দ্রক্ষণ

গত ২২ জানুয়ারি, ২০২৪-এ অযোধ্যায় শ্রীরামজন্মভূমিতে নির্মিত ভব্য রামমন্দিরে শ্রীরামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে সমগ্র ভারত ছাড়াও বিশ্বজুড়ে উৎসাহ, উল্লাস ও উৎসবের এক অনন্য বাতাবরণ পরিলক্ষিত হচ্ছে। ২০২০ সালের ৫ আগস্ট রামমন্দিরের শিলান্যাসের মহতী অনুষ্ঠানের সময়েও একইরকম উৎসব ও উৎসাহের পরিবেশ ছিল সর্বত্র। সেই দিনটিতে রামমন্দিরের শিলান্যাসের নয়নাভিরাম সমারোহের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে পুরো দেশ। বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকা দেশপ্রেমিক ভারতীয় বংশোদ্ভূতরাও প্রাণভরে উপভোগ করেন সেই অপরূপ দৃশ্য। সেই দৃশ্যের সাক্ষী অগণিত জনতার চিন্তা-চেতনায় সঞ্চারিত হয় স্বপ্নপূর্তির এক অনাবিল, আনন্দময় অনুভূতি। দীর্ঘ সংগ্রামের পর এই উপলব্ধি লাভ ছিল অতীব মহত্ত্বপূর্ণ। এই কঠিন সমস্যা সমাধানের দরুন অসংখ্য ভারতীয়ের শরীরে যেন প্রতিভাত হয় এক তেজোদ্দীপ্ত প্রভা, একই সঙ্গে তাদের চোখে ছিল আনন্দাশ্রু।

এখন এই রামমন্দির নির্মাণ শেষে অসংখ্য দেশপ্রেমিক ব্যক্তি আগের সেই মুহূর্ত অপেক্ষা বহুগুণ বেশি আনন্দ ও সার্থকতা অনুভব করছেন। অনেকের কাছে এই সমাগত মুহূর্তটি কার্যপূর্তির অন্তিম লগ্ন হলেও, বাস্তবে তা কার্যারম্ভের সেই পরম শুভক্ষণ। অনেকের ধারণা অনুযায়ী এই মুহূর্তটি কেবল রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার একটি আজন্ম লালিত স্বপ্ন সার্থক হয়ে ওঠার ক্ষণ হলেও ভারতীয় চিন্তাধারা, দর্শন ও পরম্পরা একাত্মতার সর্বাঙ্গীণ ভাবটিকেই প্রস্ফুটিত করে , যা জীবন সম্পর্কে একটি সামগ্রিক পর্যালোচনার অধ্যায় সূচিত করে। ভারতবর্ষে ধর্ম ও সামাজিক জীবনধারা সদা এক ও অভিন্ন। এই ভারতীয় দর্শন প্রতিটি ব্যক্তিকে ঈশ্বরের অংশ জ্ঞানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিত্বের মধ্যে ঐশীসত্তার প্রকাশ ঘটিয়ে মানবজাতির সামনে মোক্ষলাভের ধ্যেয় উপস্থিত করেছে। মানুষের নিজ অন্তঃ ও বহিঃপ্রকৃতির সম্যক নিয়ন্ত্রণপূর্বক এই ঐশীসত্তার প্রকাশের পথ সুগম করেছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ক্ষমতা ও প্রকৃতি অনুসারে এই উদ্দীষ্ট পথ অসংখ্য ও নানা প্রকারের হলেও ভারতীয় মত অনুযায়ী সব ক'টি পথ এক ও সমান। এই মত ও পথ অনুসরণ করেই ভারত সর্বদা চলেছে। ভারতের এই ইতিহাসের সাক্ষী সমগ্র বিশ্ব বিভিন্ন সময়ে এই দর্শনকে উপলব্ধি করেছে। এই আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হয়েও ভারত কখনোই সমৃদ্ধি ও আর্থিক সম্পন্নতা অর্জনের দিকটিকে অবহেলা করেনি। এই কারণে পুরুষার্থ চতুষ্টয়ের মধ্যে ধর্ম ও মোক্ষের সঙ্গে সমাবেশ ঘটেছে অর্থ ও কামের।

'উবন্তু' হলো আফ্রিকান জনজাতিজাত একটি মতাদর্শ, যার অর্থ হলো— 'আমি আছি, কারণ আমরা সবাই আছি'। ভারতীয় ধর্মও এই মতাদর্শ ভিত্তিক। আমি, আমরা, আমাদের পরিবার, আমাদের গ্রাম, রাজ্য, দেশ, মানবতা, মনুষ্যেতর জীব, নৈসর্গিক বিশ্ব— এই ক্রমশ বিস্তারশীল একক সমূহ সবকিছুই প্রকৃতপক্ষে পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ও একাত্ম। এই এককগুলির মধ্যে পারস্পরিক লড়াই নেই, কিন্তু সমন্বয় বর্তমান; প্রতিযোগিতা নেই, সম্মিলন বিদ্যমান। এই এককসমূহের এক সমষ্টি হলো মানব জীবন। এই সব কিছু আছে বলেই আমরাও সবাই আছি। এই সব এককগুলির মধ্যে রক্ষিত ভারসাম্যই হলো ধর্ম এবং এই ভারসাম্য রক্ষার মনোভূমিকাই ধর্মরক্ষা বা ধর্ম সংস্থাপনা।

হিন্দু রাষ্ট্রের জীবনাদর্শ ভিত্তিক লক্ষ্যপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে নিবেদিত চিরন্তন বিবর্তনই হলো রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। এখনও পর্যন্ত থেমে থাকা বা থামিয়ে রাখা যাবতীয় আবশ্যক কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। সম্পূর্ণ সমাজকে আজ হতে হবে সজাগ, সচেতন, সহযোগিতাকারী, সহায়ক ও সক্রিয়।

ভারতের দৃষ্টিতে ধর্মের এই ভাবনাকে 'রিলিজিয়ন' রূপে সংজ্ঞায়িত করা যেমন একটি ভ্রান্ত ধারণা, তেমনই তাকে আধ্যাত্মিকতার গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ রাখা একটি অপরিণত প্রচেষ্টা। আধ্যাত্মিক সাধনারত ভারতের সঙ্গে কোনো দিনই আর্থিক সমৃদ্ধি, শ্রীবৃদ্ধির ছিল না কোনো বিরোধিতা। ভারতীয় দর্শনে ধর্মের এক অনন্য ব্যাখ্যা উপস্থিত— 'যতো অভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স সিদ্ধিঃ স

ধর্মঃ'। অভ্যুদয় অর্থাৎ, আর্থিক সমৃদ্ধি। নিঃশ্রেয়সের অর্থ হলো মোক্ষ। এই আর্থিক উন্নতি ও মোক্ষ লাভের মধ্যে সেতুবন্ধন করে ধর্ম— এটিই হলো ধর্মের ব্যাখ্যায় প্রযুক্ত ভারতীয় সংজ্ঞা। ঈশাবাস্য উপনিষদে বর্ণিত তত্ত্বানুযায়ী আর্থিক সমৃদ্ধি সাধনে আবশ্যক জ্ঞান হলো অবিদ্যা এবং মোক্ষলাভের লক্ষ্যে অর্জিত জ্ঞানই হলো বিদ্যা। উপনিষদ রচয়িতাদের ব্যাখ্যানুযায়ী, অবিদ্যা ও বিদ্যা— উভয়ের উপাসনাই হলো একটি পরিপূর্ণ জীবন। অবিদ্যার মাধ্যমে জীবন এই পৃথিবীরূপী মৃত্যুলোককে সুখের সঙ্গে অতিবাহিত করে, আর বিদ্যার্জনের মাধ্যমে মোক্ষ বা অমরত্ব প্রাপ্তির পথ হয় প্রশস্ত।

বিদ্যাঞ্চ অবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্ বেদোহভয়ম্ সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াহমৃতমশ্নুতে।।

এহেন ভারসাম্যরূপী ধর্ম সম্পর্কে উপলব্ধি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের লক্ষ লক্ষ স্বয়ংসেবকের কণ্ঠে দেশ জুড়ে ধ্বনিত সঙ্ঘ প্রার্থনায় সমুৎকর্ষ (অর্থাৎ, অভ্যুদয়) ও নিঃশ্রেয়স— উভয়ের সাধনার উল্লেখ রয়েছে, যা প্রকৃতপক্ষে দুইটি ভিন্ন বা দ্বিখণ্ডিত তত্ত্ব নয়, একটি তত্ত্বেরই দুটি দিক। এই অখণ্ড তত্ত্বটির দ্বৈতসত্তর উপস্থাপনায় একবচনের ষষ্ঠী বিভক্তি 'অস্য' যোগে — 'সমুৎকর্ষ নিঃশ্রেয়স্য'-এর প্রয়োগ প্রার্থনায় করা হয়েছে। এর তাৎপর্য হলো ভারতে মানব জীবনের এই পূর্ণ উপলব্ধির পরম্পরাই চিরন্তন, যেখানে একযোগে বৈষয়িক (সমৃদ্ধি) ও আধ্যাত্মিক (মোক্ষ) উৎকর্ষ সাধনার বিবেচনা করা হয়েছে।

বহু শতাব্দী যাবৎ এই বিশ্বের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ দেশ ছিল ভারত। সামর্থ্য সম্পন্ন, শক্তিধর দেশ হলেও ভারত কোনো দিনই অন্য দেশ আক্রমণ করেনি। ব্যবসাবাণিজ্যের জন্য পৃথিবীর কোণে কোণে ভারত পৌঁছে গেলেও ভারত কোথাও উপনিবেশ স্থাপন করেনি, কোনো দেশকে শোষণ করেনি, লুঠ করেনি, কোনো জাতির ধর্মান্তরণের প্রয়াস করেনি, কাউকে দাসে পরিণত করে দাস ব্যবসা চালায়নি। ভারতীয়রা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষকে আর্থিকভাবে সম্পন্ন করে তুলতে, সমৃদ্ধ হতে সাহায্য করেছে, তাদের দান করেছে সুসংস্কৃতি। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির ভাষা, শিল্পকলা, মন্দির ও জীবনশৈলীতে আজও প্রতিভাত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সেই জীবন্ত নিদর্শন। অন্য দেশগুলিতে পৌঁছে সেই দেশগুলিকে উন্নত করে তোলার মাধ্যমে যে সমৃদ্ধি ভারতীয়রা অর্জন করেছিল, তা ভারতের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে 'মহালক্ষ্মী' রূপে বর্ণিত হয়েছে। এই দেশে 'ধনসম্পদ' নয়, 'মহালক্ষ্মী'-র আরাধনা করা হয়ে থাকে। ভারতীয় বৈভবের, সমৃদ্ধির ও সুসংস্কৃত সদাচারের সোপান ছিল এই ধর্ম (রিলিজিয়ন নয়) এবং ধর্ম স্থাপনা তথা সাধনার কেন্দ্র ছিল— মন্দির। কারণ সমগ্র জীবন সম্পর্কিত চিন্তা চেতনা সম্পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিকতা আধারিত। তাই ভারত জুড়ে মন্দির হলো আধ্যাত্মিক সাধনার সঙ্গে লৌকিক আচার এবং আর্থিক সমৃদ্ধিরও ভরকেন্দ্র।

১৯৫১ সালে সোমনাথ মন্দিরে প্রাণপ্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানে স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদের ভাষণে এই বিষয়ে বিশদ উল্লেখ পাওয়া যায়। তারই কিছু অংশ উদ্ধৃতি হিসেবে তুলে ধরা হলো—

''এই পুণ্য লগ্নে আমাদের সবার এই ব্রত গ্রহণ করা উচিত যে আমাদের শ্রদ্ধার এই ঐতিহাসিক প্রতীকটিতে যেভাবে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হলো, অনুরূপভাবে আমাদের দেশের জনসাধারণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত সেই সমৃদ্ধি মন্দিরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা মনপ্রাণ ঢেলে করব, যে সমৃদ্ধি মন্দিরের অন্যতম চিহ্ন হলো সোমনাথের এই প্রাচীন মন্দির। অতীতকালে আমাদের দেশ ছিল বিশ্বের ব্যবসাবাণিজ্যের মূল কেন্দ্র। এই কেন্দ্র হতে উৎপাদিত পণ্য সংবলিত কাফিলা (বাণিজ্যবহর) পৌঁছে যেত দূর-দুরান্তের দেশগুলিতে। এর বিনিময়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সোনা ও রুপো চলে আসত ভারতে। সেই যুগে ভারতের রপ্তানি ছিল আমদানির তুলনায় বহুগুণ। এই কারণে সেই যুগে সোনা-রুপোর একটি বৃহৎ ভাণ্ডারে পরিণত হয় ভারত। আজ যেভাবে সমৃদ্ধ দেশের ব্যাংকগুলির তোষাখানায় বিশ্বের সোনার একটা বড়ো অংশ জমা হয়ে রয়েছে, সেই ভাবে বহু শতাব্দী আগে বিশ্বজুড়ে প্রাপ্য সোনার একটা বড়ো অংশ সঞ্চিত ছিল ভারতের দেবস্থানগুলিতে। আমি মনে করি যেদিন শুধু এই পাথরগুলির উপর ভিত্তি করে নতুন সোমনাথ মন্দির নির্মিত হবে না, কিন্তু সোমনাথ মন্দির যার প্রতীক ছিল সেই 'সমৃদ্ধ ভারত' নামক ভবনটিও তৈরি হবে, সেই দিন ভগবান সোমনাথের মন্দির পুনর্নির্মাণ যজ্ঞ সম্পূর্ণ হবে। আমার ধারণা অনুযায়ী, বহু দিন আগে ঠিক যেরকম ভারত তিনি দেখেছিলেন, সেই বর্ণনা যত দিন না কোনো আধুনিক অল-বিরুনী দিচ্ছেন— আমাদের দেশের সংস্কৃতির স্তর সেই উচ্চতায় আসীন না হওয়া পর্যন্ত, ততদিন এই সোমনাথ মন্দিরের পুনর্নির্মাণ অসম্পূর্ণ থাকবে।"

শ্রীরামজন্মভূমি আন্দোলন ভারতের সেই জীবন দর্শন পুনঃস্থাপনার সংগ্রাম যাকে ধর্মনিরপেক্ষতার আড়ালে বিচ্ছিন্ন ঘোষণার ষড়যন্ত্র ভারত জুড়ে চালানো হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহনরাও ভাগবত রামমন্দির শিলান্যাসের দিন তাঁর অভিভাষণে তিনটি শব্দের উল্লেখ করেছিলেন— 'আত্মনির্ভর', 'আত্মবিশ্বাস' ও 'আত্মসচেতন'। এর মধ্যে আত্মনির্ভরতার জ্ঞান (বিদ্যা ও অবিদ্যা সমন্বিত ভারতীয় জ্ঞান) আর্থিক বিকাশ ও সমৃদ্ধির তাৎপর্যবাহী। 'আত্মবিশ্বাস' শব্দটি ভারতের প্রাচীন, কিন্তু চির নতুন ভাবধারায় অধ্যাত্ম-আধারিত একাত্মতা, সর্বাঙ্গীণ জীবনের চিন্তন আধারিত বিশ্বাস ও কৃতিশীল সংকল্পগত তাৎপর্যবাহী। 'আত্মসচেতন' শব্দটির মাধ্যমে ভারতবাসীর ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, ব্যবসায়িক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ভারতীয় দর্শনের পূর্ণ প্রতিফলনের অভিব্যক্তিটি ফুটে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে লেখেন— 'আমরা বাস্তবে যা, তাই যেন হই। জ্ঞানপূর্বক, সরল ও সচলভাবে সম্পূর্ণরূপে আমরা যেন নিজেদের খুঁজে পাই'। এইভাবে যত গভীরে গিয়ে আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক শিকড়কে স্পর্শ করব, তত বেশি করে আমরা আর্থিক সম্পন্নতা ও সাংস্কৃতিক বিস্তার অর্জন করে প্রতিযোগিতা, সংঘর্ষ, হিংসা, যুদ্ধ, শোষণ ও অত্যাচার-দীর্ণ বিশ্ব মানবিকতাকে মিলন, সমন্বয়, সংযম ও আত্মীয়তার বার্তা দিতে পারব। আমাদের আচরণের মাধ্যমে নানা মত-পথ-ভাষা ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্যপূর্ণ এই মানবজগৎকে শান্তি-সমৃদ্ধিপূর্ণ, কল্যাণকামী পথে পরিচালনে সহায়ক হতে পারব। এই আদর্শেরই উল্লেখ পাওয়া যায় সোমনাথ মন্দিরের প্রাণপ্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে ড. রাজেন্দ্র প্রসাদের

অভিভাষণের এই অংশে— 'এই সবকিছুর প্রাপ্তিস্থান ছিল এই মন্দির। পুনরায় এই সব কিছুর প্রাপ্তি কেন্দ্রে পরিণত হোক এই মন্দির— এই হলো আমাদের প্রত্যাশা। একমাত্র তখনই এই মন্দির নির্মাণ সম্পূর্ণ বলে মনে করব'। তাঁর এই ভাষণ অযোধ্যায় রামমন্দিরের বিষয়ে আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। এই কারণে, এটি সংকল্পপূর্তির সঙ্গে শুভারম্ভের একটি মাহেন্দ্রক্ষণ। এই প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয়ও তাৎপর্যপূর্ণ। রাষ্ট্রীয় আঙ্গিকে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু বিলম্বিত অনেক সিদ্ধান্ত এখন একের পর এক কার্যকর হতে দেখা যাচ্ছে। ১৯৮৭-তে রাম-জানকী রথযাত্রা চলাকালীন সঙ্ঘের একটি কার্যক্রমে তৎকালীন সরসঙ্ঘচালক বালাসাহেব দেওরসকে একজন কার্যকর্তা প্রশ্ন করেন— 'গোহত্যা বিরোধী আন্দোলন, কাশ্মীর সংক্রান্ত ৩৭০ ধারা বাতিলের দাবি আমরা প্রত্যাহার করেছি মনে হচ্ছে, কিছুই হতে দেখা যাচ্ছে না। রামমন্দিরের ব্যাপারেও কি একই কাণ্ড দেখা যাবে?' বালাসাহেবজী তাঁকে উত্তর দেন— 'আমরা এই জন্যেই রাষ্ট্রীয় জাগরণে ব্যাপৃত থাকি। এই জাগরণের কাজ কোনো না কোনো কারণে আমাদের সবসময় করে যেতে হবে। আজ হিন্দু সমাজের রাষ্ট্রীয় চেতনাবোধের স্তরের অবস্থান নিম্নগামী হওয়ার দরুন এই যাবতীয় সমস্যা প্রকট হয়ে উঠেছে। যেদিন সম্পূর্ণ সমাজের রাষ্ট্রীয় ভাবনার সাধারণ স্তর উন্নত হবে, সেই দিন হয়তো এই সব বিষয়ের সমাধান একত্রে হওয়া সম্ভব'।

ম্যালকম গ্ল্যাডওয়েলের লেখা— 'Tipping Point - How little things can make a big difference' বইতে লেখক 'Tipping Point'-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'Tipping Point বা শেষ বিন্দু বা অন্তিম মুহূর্ত হলো সেই ক্ষণ যখন ক্ষুদ্র পরিবর্তন ও ঘটনাগুচ্ছ কোনো বড়ো মাপের, গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সহায়ক হয়ে ওঠে'। বালাসাহেবজীর দেওয়া ইঙ্গিত অনুযায়ী আজ চিন্তাভাবনা করলে তার বলা কথা কি সেই Tipping Point-কেই নির্দেশ করে বলে মনে হয়!

সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক ও শ্রেষ্ঠ চিন্তক দত্তোপন্থ ঠেংড়ীজী প্রায়শই একটি কথা বলতেন— 'সমাজে রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারাসম্পন্ন কিছু ব্যক্তির সদা জাগরণ ও সক্রিয়তা শাশ্বত পরিবর্তন আনতে অক্ষম। কিন্তু সমাজের সাধারণ ব্যক্তিসমূহের রাষ্ট্রীয় চেতনাস্তরে সামান্য উন্নতি ঘটলেই, তখনই অনেক বড়ো মাপের পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এই কারণে, কিছু সমস্যা বা বিষয় সম্পর্কে সবসময় রাষ্ট্রীয় জাগরণের প্রয়াস জারি রাখা উচিত। ধীরে ধীরে সাধারণ জনসমাজের রাষ্ট্রীয় চেতনাবোধ জাগ্রত হলে, এই সবকিছুর একটি সামগ্রিক পরিণামরূপে রাষ্ট্রহিতে অনেক ছোটো-বড়ো, আবশ্যক কাজ সহজ হয়ে উঠবে। এই জন্য রাষ্ট্রীয় চেতনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কিছু ব্যক্তির সর্বদা রাষ্ট্র জাগরণমূলক কাজে অংশগ্রহণ আবশ্যক ও অতীব গুরুত্বপূর্ণ'। এখন মনে হচ্ছে, বালাসাহেব দেওরসজী এবং ঠেংড়ীজী বর্ণিত সেই 'Tipping Point' যেন এগিয়ে আসছে অতি দ্রুত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বপ্নের স্বদেশী সমাজ যেন হয়ে উঠছে সক্রিয়। রাষ্ট্রীয় জীবনের একাধিক ক্ষেত্রে, বহু বছর ধরে রাষ্ট্রহিতে বিলম্বিত মৌলিক পরিবর্তনসমূহ একের পর এক সাধিত হচ্ছে। ভারতের প্রতিরক্ষা নীতি ও বিদেশনীতির আমূল পরিবর্তন অনুভব করছে আজ গোটা বিশ্ব। অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ ও কৃষিনির্ভর অর্থনীতি আধারিত আত্মনির্ভর ভারতের সংকল্প হতে চলেছে বাস্তবায়িত। ভারতের শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত, বিশ্ব আকাশে ডানা মেলা উড়ানের মতো প্রকাশিত হয়েছে নতুন শিক্ষানীতির ঘোষণা, সমাজের অভ্যন্তর থেকে প্রকটিত উদ্যম ও উদ্ভাবনী শক্তিকে উৎসাহদানের বাতাবরণ প্রস্তুত হয়েছে এবং এই সবকিছুই এখন একত্রে হতে দেখা যাচ্ছে। ২০১৪-তে ভারতের ক্ষমতা কেন্দ্রে পরিবর্তনের সঙ্গে এই সকল পরিবর্তনকে একযোগে বিচার করাটাই হবে এক্ষেত্রে স্বাভাবিক।

২০১৪ সালের ১৬ মে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হওয়ার পর ১৮ মে, রবিবার ব্রিটেনের সানডে গার্ডিয়ান পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়র অংশটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ— 'আজ ১৮ মে, ২০১৪ দিনটি ভারত থেকে চিরতরে ব্রিটেনের প্রস্থানের দিন হিসেবে ইতিহাসে লেখা থাকবে'। এর সঙ্গে এই সম্পাদকীয়তে আরেকটি মৌলিক ও গভীরভাবে গুরুত্বপূর্ণ কথাও তুলে ধরা হয়— 'এটা স্পষ্ট যে অন্য কোনো কারণে নয়, কিন্তু অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের ফলশ্রুতিতে মিঃ মোদীর এই উত্থান'। রাষ্ট্রীয় চেতনাবোধের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার পরিণামস্বরূপ সব রকমের আকাঙ্ক্ষিত গুণগত পরিবর্তন আজ শুরু হয়েছে যার একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো ক্ষমতাকেন্দ্রের সেই পরিবর্তন। ঈশ্বর প্রদত্ত দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে ভারতবর্ষ আজ তাঁর 'চির পুরাতন, নিত্য নূতন' চিরঞ্জীবী শক্তিকে ভর করে উঠে দাঁড়াচ্ছে। সঙ্ঘের একজন প্রবীণ প্রচারক একটি বাক্যে সঙ্ঘের পূর্ণ বর্ণনা দিয়েছিলেন— 'RSS is the evolution of the life mission of this Hindu nation', অর্থাৎ এই হিন্দু রাষ্ট্রের জীবনাদর্শ ভিত্তিক লক্ষ্যপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে নিবেদিত চিরন্তন বিবর্তনই হলো রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। এখনও পর্যন্ত থেমে থাকা বা থামিয়ে রাখা যাবতীয় আবশ্যক কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। সম্পূর্ণ সমাজকে আজ হতে হবে সজাগ, সচেতন, সহযোগিতাকারী, সহায়ক ও সক্রিয়। এটা সেই আত্মসচেতনতা যার দ্বারা অতি প্রয়োজনীয়— আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতার প্রকাশ অবশ্যম্ভাবী।

একটি সঙ্ঘ গীতে বলা হয়েছে—

'অরুণোদয় হো চুকা বীর অব কর্মক্ষেত্র মেঁ জুট জায়েঁ।
অপনে খুন-পসীনে দোয়ারা নবযুগ ধরতী পর লায়েঁ।।'

(লেখক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ-সরকার্যবাহ)

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম- ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

ভারতের পুনরুত্থান এবং এককোণে শোচনীয় পশ্চিমবঙ্গ

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

সব পক্ষের কথা শুনছি। দেশ কেমন চলছে। একদল বলছে মোদী হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়। আর ওই ওরা যারা শুধুমাত্র ভিত্তিহীন বিরোধ করে, তারা বলছে দেশটা এক্কেবারেই রসাতলে গেল। কোথায় কাজ? কোথায় রোজগার? কী করবে যুবকরা? শুধু মন্দির আর ধর্মের জিগিরে কি দেশ চলে! না চলে না। সত্যিইতো শুধু মন্দির আর পুরোহিত দ্বারা দেশ চলে না। দেশের সুশাসন মানে তাতে থাকবে কর্ম সংস্থান এবং রাজকোষ ভরাটের সম্ভাবনা। এবং সে দেশেই সেই সম্ভাবনা তৈরি হয় যে দেশ তার মূলের সন্ধান করে। যে দেশ তার হৃত গৌরবের পুনরুদ্ধার করে সাংস্কৃতিক এবং সংস্কৃতি নির্ভর সংস্কার করে। দেশের মর্মে বিস্তারিত হয় স্বাজাত্যবোধ এবং নিজ ইতিহাস সমৃদ্ধ সংস্কৃতি রক্ষার নৈতিক উৎসাহ। সেই উৎসাহ দেখানো কেন এতদিন কোনো রাজনৈতিক দল করল না? কেন মোদীকেই সে দায়িত্ব পালন করতে হলো!

তবু বিরোধিতা বিশেষ করে সেকুলারজীবী এবং এ রাজ্যের তৃণমূল পন্থীদের। সেকুলারদের বিরোধের কারণ রুচি ভিত্তিক। তৃণমূলের গাত্রদাহের কারণ যতবার এক একটা সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও পরিকাঠামোগত উন্নতি দেশে হচ্ছে ততবারই বেআব্রু হচ্ছে রাজ্য হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের ভাঙাচোরা নড়বড়ে জোড়াতালি দেওয়া অনুদান সর্বস্ব এবং খেলা-মেলা নির্ভর রাজনীতি। মোদীর সাফল্যের পাশে বড্ডো বেমানান লাগছে পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক খর্বতা। সংবাদপত্রের প্রথম শিরোনাম ১৭ জানুয়ারি দেখলাম 'Ram Temple tourism : Hospitality, travel industries created up to 20,000 jobs in Ayodhya' এবং পরের পাতায় অবধারিত ভাবে পশ্চিমবঙ্গের কোনো এক বড়ো দুর্নীতি কিংবা কেলেঙ্কারির সংবাদ। লজ্জিত হতে হয় বাঙ্গালি হিসেবে। এমন বৈপরীত্যপূর্ণ সংবাদ প্রতিটা পরতে কেন্দ্র ও রাজ্যের। স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নামটাই এখন পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যমান। সে আদর্শের যত্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় কোনো ক্ষেত্রেই হচ্ছে না। তাই এককথায় 'পিছিয়ে পশ্চিমবঙ্গ'। আর দেশ? দেশ দিকে দিকে তার সমৃদ্ধ অহংকারের পুরা সাংস্কৃতিক অভিবাদনে আত্মমগ্ন। মোদীর স্লোগান 'বিকাশ ভি বিরাসত ভি'— তাতো আর কথা নয়, তা কাজে করে দেখানো এক মাইলস্টোন সংস্কার।

মে ২০২৩ পর্যন্ত সর্বমোট ৪৫টি প্রকল্পে মোট ১৫৮৪.৪২ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। প্রত্যেক প্রকল্পের লক্ষ্য ছিল ভারতের পুরা তীর্থ অঙ্গনের হৃতগৌরবের রক্ষণাবেক্ষণ এবং তীর্থপথের ব্যবস্থার উন্নতিকরণ। বিশ্বের দরবারে উচ্ছ্বসিত PRASAD প্রকল্প অর্থাৎ Pilgrimage Rejuvenation and Spriritual Augmentation Drive. কাশী বিশ্বনাথ করিডোর, মহাকাল লোক করিডোর প্রজেক্ট, মা কামাখ্যা করিডোর থেকে রামমন্দির, কিংবা ৮২৫ কিলোমিটার দীর্ঘ চারধাম সড়ক প্রকল্প, কেদারনাথ উন্নতিকল্প প্রকল্প ২০১৭, গৌরীকুণ্ড থেকে কেদারনাথ ও গোবিন্দঘাট থেকে হেমকুণ্ড সাহিব রোপওয়ে যোগাযোগ, কর্তারপুর করিডোর ভারতের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ ও পরিকাঠামোগত উন্নতি সাধান করেছে। ভারত আত্মার প্রতি মানুষের আহ্বান আরও বিহ্বলিত হয়েছে এই সব প্রকল্পের মাধ্যমে। এক একটি প্রকল্প মানে তা কেবলমাত্র মন্দির মেরামত নয়। তা এক ব্যাপ্ত কর্মযজ্ঞ। যেখানে পরিকাঠামো উন্নতির মর্মে এবং পরবর্তীতে পর্যটন এবং তীর্থ পর্যটনের সুখকর প্রশস্ত পরিবেশের জন্য মানুষের অবাধ সুগম যাতায়াত অর্থনৈতিক বলিষ্ঠ চক্রের দেশানুরাগ, আত্মানুরাগ, লোকানুরাগ সঞ্চারিত হচ্ছে।

ভারত সরকারের উদ্যোগে তৈরি হয়েছে স্বদেশ দর্শন প্রকল্প। যেখানে ৭৬টি প্রকল্প সংযুক্ত এবং তা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের দুর্গ নির্মাণ করছে অনবরত। সবাই বলছে রাম মন্দিরটাই হলো, তাও আবার করোনার কালে। একই কালে নির্মাণ হলো (২০২১) কুশীনগর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর যা মহাপরিনির্বাণ মন্দিরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করল। উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাটের বৌদ্ধ বিহার সংরক্ষণ এবং সংযুক্ত ট্যুরিজমে বদ্ধপরিকর। তাই ২০২২-এ নেপালের লুম্বিনী নগরে ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর বুদ্ধিস্ট কালচার অ্যান্ড হেরিটেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনেও আহ্বান পেলেন নরেন্দ্র মোদী। কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে হিমালয়ান অ্যান্ড বুদ্ধিস্ট কালচারাল হেরিটেজ তার বার্ধক্য রূপ ছেড়ে পুনর্গৌরব লাভ করে। ভারত এই সাংস্কৃতিক বলে বলীয়ান হয়ে পর্যটন ও প্রকল্প ভিত্তিক তীর্থ পর্যটনকে উদ্দীপ্ত ও তেজে মহীয়ান করছে বলেই এই মুহূর্তে ভারতের ঝুলিতে ৪০টি ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট এবং তার মধ্যে ৩২টিই সাংস্কৃতিক! HRIDAY অর্থাৎ Heritage City Development and Augmentation Yojana ১২টি ঐতিহ্যশালী নগরীকে আয়োজনের সঙ্গে বিশ্বের দরবারে বাহবার আনন্দবার্তা দিয়েছে।

উত্তরপ্রদেশ মানে যারা বুঝত শুধুমাত্র

পশ্চিমবঙ্গ মিথ্যার পথে চলছে বলে তা সার্বিক ভাবে দুর্বল। তা সাংস্কৃতিক ভাবে রাজ্যকে দুর্বল করছে, অর্থনৈতিক ভাবে নিঃস্ব করছে। নতুন ভারত প্রসন্ন মুখে মঙ্গলস্বরূপের প্রতি দৃঢ়। তা পরিমাপের সুপ্রবৃত্তি এখনও পশ্চিমবঙ্গের নাগালের বাইরে।

রামমন্দির তারা জানুক, উত্তরপ্রদেশ মানে ১০টি স্মার্ট সিটির রাজ্য এবং ২০২৩ -এ মোট ১০ হাজার কোটি টাকার পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রকল্প ব্যয়। লক্ষ্ণৌ থেকে আগ্রা, বারাণসী থেকে বরেলী, মোরাদাবাদ হয়ে প্রয়াগ, আলিগড়, কানপুর, সাহারনপুর, ঝাঁসি সবাই পেয়েছে উন্নতর নিকাশি ব্যবস্থা থেকে সড়ক, আন্তর্জাতিক মানের নগর পরিষেবা। পূর্বতন কংগ্রেসের আমলে কেন হয়নি এসব! তারাতো এই সরকারের মতো অযোধ্যা উন্নতি নির্মাণে মনযোগ দেয়নি। তারাতো তথাকথিত প্রগতিশীল। মথুরা উন্নয়নের কাজ কেন যোগী আদিত্যনাথের হাতেই হলো? মথুরা মানে শুধুই মন্দির সংস্কার এবং শ্রীকৃষ্ণ নামে বিভোরতা বলে অপপ্রচার করা বিরোধীরা অবগত হোক ২০১৭-র মথুরা-বৃন্দাবন মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন তৈরি এবং তারপর গঠন হলো ব্রজ তীর্থ বিকাশ পরিষদ, যা খুলে দিল কর্মের দিগন্ত। বিমানবন্দর-এইমস- সড়ক যোগাযোগে একসময়ের গুন্ডামির মথুরা হয়ে উঠছে স্মার্ট সিটি। ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানে বরাদ্দ অর্থ ১১০ কোটি টাকা। এবং ২০২২-এ মথুরা-বৃন্দাবন উন্নয়নের মোট ঘোষিত বরাদ্দ অঙ্ক ছিল ১৫ হাজার কোটি। যার মধ্যে বৃন্দাবন ও গোকুলের অন্তর্বর্তী ২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ যমুনা জল মার্গ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। গড়ে উঠছে ১০ হাজার কোটি অর্থ ব্যয়ে মথুরা, বৃন্দাবন 'লাইট মেট্রো রেল'। তাই প্রত্যেকটি তীর্থকেন্দ্র ঐতিহ্য নগরী মন্দির সংস্কার এক উন্নয়নের নিউক্লিয়াস। যে উপলক্ষ্যে নিবিষ্ট হচ্ছে আকাশ ছোঁয়া উন্নতি এবং হাজার কর্ম ঘণ্টা। কাশী বিশ্বনাথ করিডোর তৈরির পর বিশ্বের হেডলাইন হলো বারাণসী ২০২২-এ মোট ৭.২ কোটি পর্যটক আকর্ষণ করেছে, যেখানে সে বছর গোয়ার পর্যটক ছিল ৮৫ লক্ষ! অবিশ্বাস্য পরিসংখ্যান! এবং এই করিডোরের পরেই বারাণসীতে পর্যটন সংক্রান্ত উপার্জন ২০ শতাংশ থেকে ৬৫ % হলো। কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি হলো ৩৪.২ % ।

ভারতের যত পর্যটন কেন্দ্র রয়েছে তার ৬০ শতাংশ ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক। ২০২২-এ এহেন পর্যটনে অর্থনৈতিক অঙ্ক হয় ১.৩ লক্ষ কোটি যা তার আগের বছরেও ছিল ৬৫,০,৭০ কোটি টাকা। এই অঙ্ক নিশ্চিত করবে কাশ্মীরের সারদা পীঠ কিংবা উজ্জয়িনীর মহাকাল লোক করিডোর অথবা চারধাম সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক সুযোগ বৃদ্ধি, ধর্মীয় সংস্কার এবং অতি অবশ্যই পর্যটন ও অর্থনৈতিক বুনিয়াদ জোরদার করার বিশ্বাসপরায়ণ উৎসাহ। যে চারধাম কিছু আগেও ছিল পর্যটকদের আকর্ষণের কিন্তু ঝঞ্ঝাটেরও, তা আজ সুরক্ষা ও স্বাচ্ছন্দ্যেপূর্ণ। শুধু কি তাই; অলকানন্দার ওপর যে দীর্ঘ সেতুটি তৈরি হচ্ছে যা জাতীয় সড়ক ৫৮-র সঙ্গে রেলপথকে জুড়বে তা চীনের সীমান্ত ঘেঁষা। আন্তর্জাতিক সম্পর্কেও তা কৌশলী বার্তা দেবে। তীর্থ পর্যটক কেবল নয়, ভারতীয় সেনা জরুরি ভিত্তিতে এই পথেই দ্রুত যেতে পারবে সীমান্তে। একই ভাবে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কে তাৎপর্য রাখছে সারদা পীঠ সংস্কার। যেমন রামমন্দির পুনর্নির্মাণে ভারত আত্মার স্বাভিমান জাগ্রত, ঠিক একই ভাবে এই পীঠ সংস্কার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করল এ দেশ সনাতন, যেখানে কলহন রাজতরঙ্গিনী রচনা করেছেন, যেখানে হিন্দু বৌদ্ধ জ্ঞানী চর্চা করেছেন, যে কাশ্মীরের মাটিতে পণ্ডিতরা জ্ঞান প্রজ্ঞা বিনিময় করেছেন, যা ছিল তপস্যার ভূমি, সেই হৃতগৌরব বর্বর ইসলামিক শক্তির মিথ্যা ইতিহাস বলে প্রাণবায়ুহীন হতে পারে না। ২০০৫-এর কাশ্মীর ভূকম্পে ব্যাপক ক্ষতি হয় সারাদা পীঠের। কিন্তু সেকুলার কংগ্রেস একবারও তৎপর হয়নি তার সংস্কারের। আজ যখন সেখানে কাশ্মীর পণ্ডিতরা যাবেন তখন তা কেবলমাত্রই ভারত-পাক কূটনৈতিক সম্পর্কের সিমেন্টিং নয়, তা পণ্ডিত ঘরের পথে গৌরব স্থাপন। যে গৌরব মধ্য রাতের স্বপ্নের মতো অন্তর্ধৃত হয়েছিল তা যেন মুঠো বন্দি করল মোদীর সুশাসন।

সুশাসনের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের উন্নতি। যে সূচকে বর্তমান ভারত সাফল্যের হাসিতে উদীয়মান। ন্যাশনাল হেলথ্ মিশন, আয়ুষ্মান ভারত— প্রধানমন্ত্রী জনআরোগ্য যোজনা, প্রধানমন্ত্রী আয়ুষ্মান ভারত হেলথ ইনফ্রাস্ট্রাকচার মিশন, ন্যাশনাল প্রোগ্রাম অব প্রিজারভেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল অব ক্যান্সার, ডায়াবেটিস, সিভিডি, স্ট্রোক, ন্যাশনাল ভেক্টর বোর্ন ডিজিজ কন্ট্রোল প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্য সুরক্ষা যোজনা এবং একাধিক এইমস স্থাপন ভারতের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে নব দিশা এবং উচ্চতা প্রদান করেছে। ২০২২-এই ১৬টি এইমস গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং যার জন্য মোট ২০, ৯৪৪ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়। কোভিডে ভ্যাকসিন মৈত্রী প্রোগ্রামে বিশ্বের ১৫০টি দেশ যখন ভারতের মেডিক্যাল সাপোর্ট পেল তখন প্রমাণিত হলো দেশের সুশাসনে শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক উৎসাহই প্রাধান্য পায় না, স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় ভারত তাবড় সব দেশকেও টেক্কার পথে। ২০১৪ থেকে ২০২৩-এ ভারতের মেডিক্যাল কলেজের গ্রোথ ৭৮ শতাংশ সেখানে আমেরিকার ৯ শতাংশ, কানাডার ০ শতাংশ! ন্যাশনাল ডিজিটাল হেলথ মিশন 'এক ভারত এক স্বাস্থ্য ইকো সিস্টেম' গঠনে তৎপর হয়।

এছাড়াও আয়ুষ সেন্টার মানেও চিকিৎসা সংস্কৃতির পুনর্নির্মাণ। আয়ুর্বেদ, ইউনানি, হোমিওপ্যাথি, নেচেরোপ্যাথি যা যা বহুল চর্চিত নয়, ক্রম ম্রিয়মাণ সেসবের পুনর্চর্চা ও জনকল্যাণে অধিক মাত্রায় উন্মীলিত করা। প্রধানমন্ত্রী জনওষধি পরিযোজনা ৫০-৯০ শতাংশ স্বল্প মূল্যে জেনেরিক মেডিসিন দিচ্ছে কমপক্ষে ৯২০০টি কেন্দ্রে। কেন্দ্র ২০১৩-১৪ বাজেটে হেলথ্ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার খাতে বরাদ্দ রাখল ৩৩, ২৭৮ কোটি এবং তা ২০২৩-২৪-এ হলো ৮৬,১৭৫ কোটি টাকা। ২০১৫-১৬-তে হেলথ কেয়ারে ব্যয় ছিল ৩৪.১৩ কোটি টাকা যা ২০২৩-২৪-এ হলো ৮৮.৯৫ কোটি। ২০১৪-তে এইমসের সংখ্যা ছিল ৭টি, ২০২৩-এ সব মিলিয়ে ২৩টি, আয়ুষ ইন্ডাস্ট্রির মার্কেট সাইজ ২০১৪-১৫-তে ছিল ২৩,৫৩২ কোটি টাকা এবং তা ২০২০-তে ১.৪৯ লক্ষ কোটি টাকা। আমাদের রাজ্যের যখন প্রায়ই সংবাদ হয়— খোদ কলকাতার সরকারি হাসপাতালে এটা আছে তো ওটা নেই। ডাক্তার আছে তো যন্ত্র নেই। যন্ত্র আছে তো যন্ত্রী নেই। যখন সবেতেই রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র এবং তাঁর শিকার হচ্ছে সাধারণ মানুষ। তখন কেন্দ্র ২০১৪-তেই দেশের কোনায় কোনায় সব মিলিয়ে ৫ হাজারেরও বেশি মলিকিউলার ডায়াগনস্টিক সেন্টার গঠন করে। কিন্তু এই সকল সীমিত তথ্য থেকে এটুকু স্পষ্ট যে রাজ্য হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের নামের আগে এবং পরে প্রতিদিন যখন অরাজকতার খবর পাই এবং আরও অসংখ্য নেতিবাচক খবর পাই, তার পাশে ভারতের এই সার্বিক সুশাসন এবং সে পথে অগ্রগমন যেন দুই ভিন্ন পৃথিবী।

পশ্চিমবঙ্গে কেন প্রশাসনিক শৃঙ্খলতা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা শিবিরে সুষ্ঠু আলো উপেক্ষিত? কারণ সার্বিক ভাবে সুশাসনের প্রসন্ন মুখ পশ্চিমবঙ্গ দেখতে পাচ্ছে না। শাসনের আশ্বাসবাণীটুকুও এখানে জোটে না। ভারতের এখনও সুদীর্ঘ উন্নয়নের পথে অগ্রসর হওয়া বাকি, তা নিয়ে সংশয় নেই। বহু বছরের অপশাসনের শীত ঘুম যেভাবে বিগত ৯ বছরে ভাঙছে, তা আশার কথা বই কী। ভারত সাংস্কৃতিক ধর্মীয় প্রাঙ্গণে সত্য কথা বলার সাহস রাখছে। সে আর গুটিসুটি মেরে নেই। সেই জাতিসত্তার জাগ্রতবোধেই প্রশাসনিক শৃঙ্খলতার মধ্যে সাংস্কৃতিক সংস্কার সাধন এবং তাকে কেন্দ্র করে যে অর্থনৈতিক রাজপথ ক্রমশ প্রশস্ত হচ্ছে তা যেন সত্যানুরাগ প্রচারের অনুঘটক। পশ্চিমবঙ্গ মিথ্যার পথে চলছে বলে তা সার্বিক ভাবে দুর্বল। তা সাংস্কৃতিক ভাবে রাজ্যকে দুর্বল করছে, অর্থনৈতিক ভাবে নিঃস্ব করছে। নতুন ভারত প্রসন্ন মুখে মঙ্গলস্বরূপের প্রতি দৃঢ়। তা পরিমাপের সুপ্রবৃত্তি এখনও পশ্চিমবঙ্গের নাগালের বাইরে। □

ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের দ্বিচারিতার স্বরূপ

কমিউনিস্টরা ১৯৪৬-৪৭ সালে ভারতবর্ষের সমস্ত মুসলমানকে সম্প্রদায়গত ভাবে গরিব, সর্বহারা এবং হিন্দুদের সম্প্রদায়গত ভাবে বুর্জোয়া ছাপ দিয়ে হিন্দুনিধনে তোল্লা দেয়। ১৯৪৬-এ কলকাতা নরসংহারের সময় মেটিয়াবুরুজে যে চার হাজার হিন্দু দিনমজুর ও শ্রমিককে খুন করা হয়, সে বিষয়ে ভারতের কোনো কমিউনিস্ট দল একটি কথাও খরচ করেনি।

ড. নারায়ণ চক্রবর্তী

১৯২০ সালে তাসখন্দে জন্ম হওয়া ভারতের কমিউনিস্ট দল এবং বিভিন্ন সময়ে নেতৃত্বের স্বার্থের প্রয়োজনে তার থেকে ভেঙে বেরিয়ে আসা কমিউনিস্ট দলগুলি একক বা সঙ্ঘবদ্ধভাবে কখনো দেশের প্রধান শক্তিতে পরিণত হওয়া তো দূরের কথা, জন্মের একশো বছরের মধ্যেই প্রান্তিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। মনে হয়, অদূর ভবিষ্যতে প্রাদেশিক দলগুলির আনুকূল্য না পেলে তারা সর্বভারতীয় দলের তকমাটাও হারাবে! এর কারণ খুঁজতে গিয়ে প্রথমেই যেটা মনে হয়, তা হলো, ভারতের স্বাধীনতার পর কংগ্রেসের শাসনে দেশের অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তারা খাদ্য, বাসস্থান ও শিক্ষার দাবিতে যে আন্দোলন শুরু করে সফলতা পেয়েছিল, তা নিজেরাই নষ্ট করেছে নেগেটিভ রাজনীতি ও ধর্মীয় ঘৃণা ছড়িয়ে।

যখন দেশে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার আন্দোলন তীব্র হচ্ছিল, তখন তারা সেই আন্দোলনের বিপরীত দিকে গিয়ে ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধাচরণের বদলে গরিব, অসহায়, সর্বহারার নামে সাম্প্রদায়িক, হিন্দুবিদ্বেষী মুসলিম লিগকে শর্তহীন সমর্থন করতে শুরু করল। সেই প্রথম তারা দেশের সংখ্যাগুরু মানুষের সরাসরি বিরুদ্ধে গিয়ে নিজেদের পায়ের তলার জমি শক্ত করতে চাইল। পরাধীন দেশে যত মুসলিম লিগের আগ্রাসন বাড়তে থাকে, কমিউনিস্ট পার্টি তত লিগের সমর্থনে প্রকাশ্যে এগিয়ে আসে। এমনকী, ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট মুসলিম লিগের ডাকা ডাইরেক্ট অ্যাকশানের মিটিঙে, যেখান থেকে সুরাবর্দি, খাজা নাজিমুদ্দিনরা সরাসরি হিন্দু-নিধনের ডাক দিয়েছিল, সেই মিটিঙে সহযোগী দল কমিউনিস্ট পার্টি শুধু যোগই দেয়নি, তাদের নেতা কমরেড জ্যোতি বসু সেদিন অক্টারলোনি মনুমেন্টের নীচে মঞ্চ আলো করে এই লিগ নেতাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টির ঘোষিত নীতি ছিল— পাকিস্তান দিতে হবে তবে ভারত স্বাধীন হবে! তারা মুসলিম লিগের সঙ্গে মিছিলে গলা মিলিয়ে নারা লাগাত-'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান'! এমনকী স্বাধীনতার পরে দেশের প্রথম ও দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে তারা স্লোগান তুলত, 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়, ভুলো মত, ভুলো মত'।

তারপর এল ১৯৬২-এর চীনা আগ্রাসন। সে সময় সোভিয়েত রাশিয়ার দাক্ষিণ্যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির লাফালাফি চলছে। এই আগ্রাসনের প্রশ্নে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে প্রথম বড়ো ভাঙন দেখা দিল। এর প্রধান কারণ নেতৃত্বের সংঘাত। যেহেতু দলটি তার জন্মের শুরু থেকেই দ্বিচারিতাকে দলের বাড়বাড়ন্তের মূল রাস্তা বানাতে চেয়েছে, সেহেতু নিজেদের দেশের স্বার্থে চীন একদল নেতৃত্বলোভী কমিউনিস্টদের মগজধোলাই করিয়ে তাদের দিয়ে খোলা বিবৃতি দেওয়ালো যে, চীন নয়, ভারতই চীনকে আক্রমণ করেছে!

অবাস্তবকে সত্যি বলে চালানোর গোয়েবলসীয় প্রচার ভারতীয় কমিউনিস্টদের আরেক বৈশিষ্ট্য। এই সময় সোভিয়েত রাশিয়া ভারতের পাশে থাকায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি আড়াআড়িভাবে দু'ভাগ হয়ে গেল। জ্যোতি বসু, মুজফ্‌ফর আহমেদের মতো নেতারা কিছুদিন সীমানায় বসে জল মেপে যখন দেখলেন দ্বিতীয় দল ভারী হচ্ছে, তখন তারা এই দলে ভিড়ে গেলেন! শ্রীপাদ ডাঙ্গের নেতৃত্বে সিপিআই এবং হরকিষেন সিংহ সুরজিত, জ্যোতি বসুদের নেতৃত্বে সিপিএম— দুভাগে ভাঙল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। এরা সোভিয়েত ও চীন, এই দুই দেশের অঙ্গুলীহেলনে ভারতের রাজনীতির আঙিনায় নাচতে লাগল! অবধারিতভাবে এমন আদর্শের দলে আরও ভাঙন অবশ্যম্ভাবী ছিল।

তারপর একটি বাঙ্গালি প্রবাদ মনে পড়ল! 'লঙ্কায় রাবণ মলো, বেহুলা কেঁদে আকুল হলো'! চীনে কালচারাল মার্কসিজমের দাপট শুরু হলো। নেতৃত্বের ক্ষমতা দখলের লড়াইকে ইজমের দোহাই পেড়ে সমর্থনের আশায় তাদের কলকাঠি নাড়ানোর ফল হলো, সিপিএমের চেয়ে বড়ো মার্কসবাদী দল হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)-র উত্থান! এদের স্লোগান— 'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান' এবং 'ধনীর গায়ের চামড়া দিয়ে গরিবের পায়ের জুতো তৈরি হবে'! দুর্ভাগ্য আমাদের। যারা গরিব, সর্বহারার কথা বলে, তারাই সর্বহারার সর্বস্ব হাতিয়ে নিয়ে বাঁচার জন্য ক্রীতদাসের মতো জীবনযাপনে বাধ্য করে। প্রথম স্লোগানটি সরাসরি ভারতের জাতীয়তাবোধের বিরোধী। দ্বিতীয়টি মার্কসীয় তত্ত্বের পরিপন্থী। রাশিয়ার 'সোভিয়েত রাশিয়া' হয়ে ওঠার জন্য যে শোষণ, পীড়ন এবং উগ্র সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণের সুত্রপাত হয়েছিল, নিপীড়িত মানুষের জাতীয়তাবোধ সে সোভিয়েতের পতনের কারণ হলো। চীন তার জাতীয় স্বার্থে ভারতের বিভিন্ন কমিউনিস্ট দলকে মদত ও তোল্লা দিয়ে ভারতের জাতীয়তাবোধ বিরোধী দলে পরিণত করল। আর এই কমিউনিস্টরাও চীনের ফাঁদে ধরা দিল।

যদিও এ দেশের কমিউনিস্টরা সর্বদা সর্বহারার কথা বলে, তারা ১৯৪৬-৪৭ সালে ভারতবর্ষের সমস্ত মুসলমানকে সম্প্রদায়গত ভাবে গরিব, সর্বহারা এবং হিন্দুদের সম্প্রদায়গত ভাবে বুর্জোয়া ছাপ দিয়ে হিন্দুনিধনে তোল্লা দেয়। ১৯৪৬-এ কলকাতা নরসংহারের সময় মেটিয়াবুরুজে যে চার হাজার হিন্দু দিনমজুর ও শ্রমিককে খুন করা হয়, সে বিষয়ে ভারতের কোনো কমিউনিস্ট দল একটি কথাও খরচ করেনি।

এই কমিউনিস্টরা কংগ্রেস সরকারের রাজনৈতিক ভুলের কারণে কেরালা ও পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসে। তখন পশ্চিমবঙ্গ, অসম ও ত্রিপুরায় পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তুদের সঙ্গে ভারতের কংগ্রেস সরকারের বিমাতৃসুলভ ব্যবহারের কারণে এই উদ্বাস্তুদের কাছে কমিউনিস্টরা কপট সমব্যথীর মতো আচরণ করে তাদের রাজনৈতিক সমর্থন আদায়ে সমর্থ হয়। এভাবে এই তিন রাজ্যে তাদের ভোট বাক্স স্ফীত হয়— বিশেষত পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায়। কিছু ক্ষেত্রে এদের দলীয় সংগঠনে তারা যুক্ত করে নেয়। তারপর মূলত এদের ভোটের দৌলতে রাজ্যে ক্ষমতায় এসে পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্টরা বিশেষত সিপিএম গরিবের অন্ন, বাসস্থান ও শিক্ষার ব্যবস্থা না করে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্যের বারোটা বাজিয়ে দেয় হিংস্র ট্রেড ইউনিয়নের বাড়বাড়ন্ত করতে গিয়ে। শিক্ষায় দলীয় রাজনীতির অনুপ্রবেশ ও প্রশাসনিক মদতে শিক্ষার উৎকর্ষতা নষ্টের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার পরিবেশ বিষিয়ে দেওয়া হলো। অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রে এবং শিক্ষায় কমিউনিস্ট রেজিমেন্টেশান প্রতিষ্ঠিত হলো।

অন্যদিকে ভূমিসংস্কারের নামে সব বড়ো জমির মালিকদের থেকে জমি ছিনিয়ে নিয়ে অসংখ্য দলীয় আনুগত্যে থাকা পেটি-বুর্জোয়া তৈরি হলো। এর দুটি অত্যন্ত খারাপ ফল হলো— ছোটো জমিতে ভবিষ্যতের আধুনিক চাষবাসের পদ্ধতির প্রয়োগে অসুবিধা; দ্বিতীয়ত, গ্রামবাঙ্গলায় জনবিন্যাসে আমূল পরিবর্তন। এই সময় থেকেই দলীয় সমর্থনে পূর্ববঙ্গ থেকে মুসলমান অনুপ্রবেশ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেলেও কেন্দ্রের কংগ্রেসি সরকার চোখ বন্ধ করে থাকে! এই বিদেশি মুসলমানদের ভারতীয় রেশন কার্ড এবং পরবর্তীতে ভোটার কার্ড তৈরিতে রাজ্যের বামপন্থী শাসক দল যথেষ্ট সাহায্য করে। এদের সবাই ওপার বঙ্গের (অধুনা বাংলাদেশের) নাগরিক। এদের এই পশ্চিমবঙ্গে থাকতে সাহায্য করে কমিউনিস্টরা শুধু ভারতীয় হিন্দুদেরই নয়, দেশীয় মুসলমানদের পর্যন্ত ক্ষতি করেছে। এই কারণেই দেশীয় হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে পশ্চিমবঙ্গের জন্য সিএএ লাগু করা আশু প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে, সিটিজেনশিপ কার্ড পাকিস্তান ও বাংলাদেশ উভয় দেশেই আছে।

তবে ভারতের নাগরিকদের সুবিধার জন্য এই কার্ডের ব্যাপারে আপত্তি কেন? এদিকে বাম আমলে শ্রমিক ও কৃষকের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান তো দূরের কথা, তাদের দলীয় ক্যাডারে পরিণত করে দলীয় সংগঠন বৃদ্ধি এবং ভোটের সময় জাল, জোচ্চুরি, ছাপ্পা ভোট ও ভোট-হিংসার কাজে লাগানো হলো খুব সুচারুরূপে। এতে মানুষের স্বাধীন চিন্তার সুযোগ সংকুচিত হলো। এর অবিসংবাদী ফল হলো একের পর এক বামফ্রন্ট সরকারের বকলমে সিপিএমের শাসন মানতে রাজ্যবাসী বাধ্য হলো। এই কমিউনিস্টরা কয়েকটি ক্ষেত্রে কখনো তাদের লাইন পালটায়নি। প্রথম, তারা যে কোনো ভারত-বিরোধী ঘটনা ও কাজে উৎসাহ বোধ করে। দ্বিতীয়, শুধু এই উপ-মহাদেশেই নয়, তারা সারা পৃথিবী জুড়ে সব জায়গায় ইসলামের জেহাদি কার্যকলাপকে সমর্থন করে। এমনকী সম্প্রতি ইজরায়েল বনাম হামাস সংঘর্ষে তারা খোলাখুলি হামাসকে সমর্থন করেছে। সেখানেও অবশ্য তারা তাদের দ্বিচারিতা ও মিথ্যাচার বজায় রেখেছে। তারা হামাসকে প্যালেস্তাইন বলে চালাতে চাইছে। অথচ ঘটনা হচ্ছে, হামাসের সঙ্গে প্যালেস্তাইনের ফাতাহ্‌র সম্পর্ক আদায়-কাচকলায়।

কমিউনিস্ট শাসনের দ্বিচারিতায়, বিশেষত মরিচঝাঁপিতে উদ্বাস্তু পরিবারগুলির

উপর পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে হত্যা এবং বালিগঞ্জে বিজন সেতুর উপর পূর্বপরিকল্পিত হামলায় আনন্দমার্গী অবধূতদের নৃশংস হত্যা— এসব প্রাক্তন উদ্বাস্তু পরিবারদের ক্রমশ কমিউনিস্ট শাসকদের থেকে দূরে সরে যেতে অনুঘটকের কাজ করে।

তারপর এই দ্বিচারিতার কারণেই কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের সমর্থনকারী দল কমিউনিস্টরা হাস্যকর কারণে সরকারের থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করলে কংগ্রেসও তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গের পরবর্তী নির্বাচনে তাদের থেকে বেরিয়ে গিয়ে জন্ম নেওয়া রাজনৈতিক দলের সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জিকে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতায় আনতে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কেন্দ্রের প্রত্যক্ষ মদতে সিপিএমের রিগিং মেশিনারি অনেকটা নিষ্ক্রিয় করেন তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জি পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসেন। 'সিপিএমের মেধাবী ছাত্রী' মমতা ক্ষমতায় এসেই সিপিএমের কায়দায় অত্যাচার, চুরি, দলীয় শাসন ইত্যাদি বহুগুণ বিস্তৃত করলেন। দুর্নীতির গণতান্ত্রিকীকরণ করে রাজ্যের প্রশাসন ও পুলিশকে দলদাসে পরিণত করলেন। রাজ্যের অর্থনীতি ধ্বংস করে শিল্প, বাণিজ্যকে এমন বার্তা দিলেন যে, সিঙ্গুর, নন্দীগ্রামের ঘটনার পর আজ পর্যন্ত রাজ্যে কোনো সফল মেগা শিল্প প্রজেক্ট বাস্তবায়িত হলো না। তার চেয়ে বড়ো কথা হলো, এইসব চোর, খুনি, লুটেরাদের সিপিএম দলের গুরুত্বপূর্ণ ক্যাডার বানালেও নেতৃত্বে ধবধবে সাদা পঞ্জাবির নেতাদের রেখেছিল; অথচ, তৃণমূল এদেরই দলের নেতা, মন্ত্রী বানিয়ে দিল।

এই যে সন্দেশখালির ঘটনায় শেখ শাজাহান কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অফিসারদের তার ডেরা থেকে পিটিয়ে, ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দিল, সেই শেখ শাজাহানকে সিপিএম দলে এনে প্রথম ভেড়ান ওই দলের এক অঞ্চল প্রধান। শাজাহানের হাতেখড়ি ভেড়ি দখল দিয়ে শুরু। তারপর যখন তৃণমূল ক্ষমতায় এসে সব অসামাজিক কাজকে রাজনীতির মোড়কে 'শুদ্ধ' করে নিচ্ছে, তখন ২০১৩ সালে শেখ শাজাহান তৃণমূলের নেতা হয়ে বসে। অল্প কিছুদিনের মধ্যে নিজের গুণ্ডামিকুশলতায় দলের সুপ্রিমোর নজরে গিয়ে তার রাজনৈতিক নেতৃত্বের উচ্চতর স্তরে প্রতিষ্ঠা হয় এবং অঞ্চলের 'ভাইজান' হিসেবে সে প্রতিষ্ঠা পায়। সন্দেশখালিতে আইন, আদালত, কাজকর্ম এমনকী 'গণতান্ত্রিক' ভোট পর্যন্ত সব কিছুই শেখ শাজাহানের নিয়ন্ত্রণে। সারা পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্টরা যে রাজনীতি তৈরি করেছে, তার বাড়বাড়ন্ত এখন রাজ্য জুড়ে অসংখ্য 'শেখ শাজাহান' সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করছে। এর একটা খারাপ দিক হলো, এই ফ্রাঙ্কেনস্টাইন যারা সৃষ্টি করেছে, এক সময় তারাই তাদের সৃষ্টির দ্বারা ধ্বংস হয়।

এটা অনস্বীকার্য যে, পশ্চিমবঙ্গের জন্ম এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে। সৃষ্টি হওয়ার পর এই রাজ্যের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের যে নজর ও সাহায্য দেওয়ার দরকার ছিল, তা জওহরলাল ও তার পরবর্তী কংগ্রেস সরকারের থেকে কখনোই পাওয়া যায়নি। বিধান রায়ের মৃত্যুর পর পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিজমের নামে জাতীয়তাবোধের বিরোধিতা করে যুবমানসে যাতে দেশপ্রেম জাগ্রত না হয়, তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালানো হয়েছে। এই চেষ্টার ফলশ্রুতিতে এই রাজ্যে ইসলামি ধর্মনিরপেক্ষতা এবং হিন্দুত্বের বিরোধিতার চাষ করা হয়েছে। শুধুমাত্র হিন্দুধর্ম ও হিন্দুদের পূজার্চনাকে বিদ্রূপ করাকেই আধুনিকতার মাপকাঠি মানা হয়েছে! রোটি, কাপড়া অউর মকান— স্লোগান যখন কেন্দ্রীয় সরকার কার্যকরী করার দিকে বিভিন্ন প্রকল্প শুরু করল, তখন কমিউনিস্টদের এই 'ভাত দে', 'শিক্ষা দে'র ধ্যাষ্টামো ধীরে ধীরে রাজ্যের মানুষের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল।

সম্প্রতি ব্রিগেডে সিপিএমের যুব সংগঠন যে জমায়েত করেছিল সেখানে আবার ভাত দে, চাকরি দে-র— ভড়ং দেখা গেল। এরা কখনো বিকল্প পজিটিভ চিন্তাধারার প্রকল্প মানুষের সামনে তুলে ধরে না। শুধুমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলের কুৎসা এবং তাদের চোখা, কখনো শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করে, বাক্যবাণ প্রয়োগে আত্মশ্লাঘা অনুভব করে। অতুল্য ঘোষের চোখের সমস্যাকে কুৎসিতভাবে 'কানা অতুল্য' বলে তুলে ধরা; ইন্দিরা গান্ধীর কার্টুনে নখ, দাঁত দিয়ে রক্ত ঝরা ডাইনির রূপ দেওয়া; রাজীব গান্ধীকে বফোর্স গান্ধী বলে সম্বোধন করা হয়তো বর্তমান কংগ্রেস নেতৃত্ব বিস্মৃত হয়েছে। তবে বাঙ্গালি এখনো এসব ভোলেনি। ১৯৪৬-এ কলকাতা নরসংহারের সময় মুসলিম লিগের 'ইনসাফ' চাওয়াকে সমর্থনকারী কমিউনিস্টদের বর্তমান ব্রিগেডে ইনসাফ চাওয়ার কথা মনে করাচ্ছে। সে সময় মুসলিম লিগের ইনসাফ ছিল কার বিরুদ্ধে? ব্রিটিশ শাসক তাদের আলাদা দেশ হিসেবে পাকিস্তান দিতে রাজি। কংগ্রেসও দেশভাগ মেনে নিয়েছিল।

তাহলে এই ইনসাফের নামে মুসলিম লিগ ও তাদের সহযোগী কমিউনিস্টদের ইনসাফ কার বিরুদ্ধে তা ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে। নির্বিচারে হিন্দু হত্যাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য--- এই ব্যাখ্যা ইউরোপীয় সাংবাদিকের লেখায় পর্যন্ত উল্লেখিত। তাই ভয় হয়, আবার 'ইনসাফ'-এর নামে এরা কী চাইছে?

এখন কমিউনিস্ট শাসনের উন্নততর সংস্করণ তৃণমূলি শাসনে- রাজ্যের মানুষের প্রতিবাদের অধিকারটুকুকে পর্যন্ত কেড়ে নিচ্ছে— প্রতিরোধ তো দূরের কথা। এই রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে ১৯৭৮ থেকে ২০১৪-'১৫-র কাশ্মীরের কথা। সে রাজ্যের মতো এ রাজ্যেও ইসলামি দেশের সঙ্গে বিস্তৃত খোলা সীমান্ত রয়েছে। এ রাজ্যের সঙ্গে যে সীমান্ত রয়েছে তা কিন্তু প্রাকৃতিক অনুকূল পরিবেশে। যদিও এই মুহূর্তে বাংলাদেশে শেখ হাসিনার আওয়ামি লিগ সরকার ক্ষমতায় আসীন, সে দেশের সাম্প্রতিক নির্বাচনে জেহাদি ইসলাম সমর্থিত খালেদা জিয়ার বিএনপি নির্বাচন বয়কট করে। লক্ষ্য করার বিষয় হলো, এই নির্বাচনে ভোট পড়েছে ৫০ শতাংশের কম! এতেই ওই দেশের সাধারণ মানুষের মানসিকতার আঁচ পাওয়া যাচ্ছে। তাই, সাধু সাবধান। □

শ্রীরামের রাজনীতি ও সুশাসন

ভরতকে রাজনৈতিক কর্তব্যবোধের পাঠ

সাধন কুমার পাল

মহর্ষি বাল্মীকি এবং গোস্বামী তুলসীদাস তাদের নিজস্ব শৈলীতে ভগবান শ্রীরামের চরিত্র ও জীবন রচনা করেছেন। তুলসীদাস শ্রীরামচরিতমানসে রামরাজ্যের ধারণাটিকে সত্য করে তুলেছিলেন, অন্যদিকে মহর্ষি বাল্মীকি স্বয়ং ভগবান রামের মুখ থেকে একজন ভালো যোগ্য রাজা, তার মন্ত্রীসভা, রাজনীতি, কূটনীতি, শান্তি নীতি, সামরিক নীতি, অর্থনৈতিক নীতি, ধর্মীয় নীতি সম্পর্কে বলিয়েছেন।

আজকের দিনে রাজনীতিবিদরা জনাদেশের নাম করে করতে পারেন না এহেন কাজ নেই। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র দেখিয়ে দিয়েছেন নীতি আদর্শের স্থান জনাদেশের অনেক উর্ধ্বে। ১৪ বছরের বনবাস যাত্রার সময় রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে অযোধ্যাবাসী শ্রীরামের বনবাস যাত্রা ঠেকানোর সমস্ত রকম প্রয়াস করেছিল। কিন্তু শ্রীরাম জনমতকে গুরুত্ব না দিয়ে নিজের আদর্শ পালনে অবিচল ছিলেন। শ্রীরাম যখন তার পিতা ও মাতার আদেশে অযোধ্যা রাজ্য ত্যাগ করে স্ত্রী সীতা ও ভাই লক্ষ্মণের সঙ্গে বনে চলে যান, তখন কৈকেয়ীপুত্র ভাই ভরত তার মাতামহের বাড়ি গিয়েছিলেন। ফিরে এসে যখন তিনি সবকিছু জানতে পারলেন, তখন তিনি তার দলবল নিয়ে বনে তার অগ্রজ শ্রীরামকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে আনতে যান এবং তাঁকে অযোধ্যার শাসনভার গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেন। শ্রীরাম ভরতকে বুঝিয়েছিলেন যে পিতা-মাতার কথা পালন রঘুকুলের রীতি, তাই তিনি ১৪ বছরের বনবাস পূর্ণ না করে অযোধ্যায় ফিরে যেতে পারবেন না। কিন্তু তিনি তার ছোটো ভাই ভরতের কাছ থেকে তার কুশল জানতে চান এবং রাজপাট সংক্রান্ত অনেক প্রশ্নও করেন।

তিনি ভরতকে সুশাসনের কথা বলেন, কিন্তু তাঁর কথায় কোনো উপদেশ বা আদেশ নেই। যেহেতু শ্রীরাম ধর্ম-অর্থ-কাম- মোক্ষের নিয়ম অনুসরণকারী একজন মহান ব্যক্তি ছিলেন, তাই তিনি প্রথমে ভরতকে জিজ্ঞাসা

করেছিলেন, 'ভাই তুমি কি পণ্ডিত, ব্রহ্মবেত্তা এবং ইক্ষ্বাকু বংশের ধর্মের জন্য সর্বদা প্রস্তুত আচার্য মহাতেজস্বী বশিষ্ঠের পূজা কর?' তুমি কি সর্বোত্তম পরিবারে জন্মগ্রহণকারী, বিনয়ী, বহু-শিক্ষিত, যারা কারও দোষ দেখেন না এবং ধর্মগ্রন্থের প্রতি নিরন্তর নজর রাখেন এমন পুরোহিতদের তুমি কি সম্পূর্ণভাবে আদর সম্মান ও সেবা করে থাকো? তুমি কি দেবতাদের, পূর্বপুরুষদের, সেবকদের, পিতৃতুল্য, বৃদ্ধ, বৈদ্য, ব্রাহ্মণদের সম্মান করে থাকো?

রাজার মন্ত্রীমণ্ডল কেমন হবে শ্রীরাম তাঁর প্রশ্নের মাধ্যমে ভরতকে ব্যাখ্যা করেন— 'ভরত! নিজের মতো সর্বগুণ সম্পন্ন, শাস্ত্রজ্ঞ, সাহসী, জিতেন্দ্রিয়, অভিজাত এবং শুধু বাহ্যিক প্রচেষ্টায় মন বোঝেন এমন যোগ্য লোকের সমাবেশ ঘটিয়ে মন্ত্রীসভা বানিয়েছো? ভালো উপদেষ্টামণ্ডলীই রাজাদের বিজয়ের প্রধান কারণ। এটাও তখনই সফল হয় যখন নীতিশাস্ত্রের শিরোমণি অমাত্য মন্ত্রী এই মন্ত্রণা গোপন রাখেন। একজন মন্ত্রী মেধাবী, সাহসী, চতুর ও নীতিবান হন তাহলেও রাজা বা রাজপুত্র বিপুল সম্পদ অর্জন করতে পারেন। রাজা তার কাছে এক হাজার বা দশ হাজার মূর্খ রাখলেও প্রয়োজনে তাদের কাছ থেকে কোনো ভালো সাহায্য পাওয়া যায় না। রাজা, অমাত্য শিরোমণি এবং মন্ত্রীদের মধ্যে যে আলোচনা হয় তা গোপন রাখা উচিত। শ্রীরাম এই বিষয়ে জোর দেন যে, কোনো মহৎ কাজ শেষ হলেই তা অন্য রাজাদেরও জানা উচিত। তিনি ভরতকে জিজ্ঞেস করেন, 'যে কোনো গোপন উপদেশ মাত্র দুই থেকে চার কান পর্যন্ত গোপন থাকে, ছয় কান পর্যন্ত গেলে তা গোপন থাকে না। তাই আমি জিজ্ঞাসা করি, কোনো গভীর বিষয় নিয়ে তুমি তো একা চিন্তা করো না অথবা অনেকের সঙ্গে বসে পরামর্শ তো করো না? তোমার স্থির করে ওঠা কোনো মন্ত্রণা শত্রুর রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে না তো? তোমার সমস্ত কাজ শেষ হলে বা তুমি যখন পূর্ণতার কাছাকাছি পৌঁছে যাও তখনই এটি অনান্য রাজাদের জ্ঞাতসারে চলে আসে, তাই না? তারা কি তোমার ভবিষ্যৎ কর্মসূচি আগে থেকেই জানতে পারে? এমনকী তোমার সিদ্ধান্ত বা মতামত তুমি বা তোমরা মন্ত্রীরা প্রকাশ না করলেও, অন্যরা যুক্তি ও কৌশলের মাধ্যমে তা জানতে পারে না তো? অন্যের গুপ্ত চিন্তা সম্পর্কে তুমি এবং তোমার অমাত্যদের অবগতি হয় নিশ্চয়ই, তাই না?' মহর্ষি বাল্মীকি তাঁর রামায়ণে ভগবান রামের মুখে ভরতকে একজন ভালো সেনাপতির গুণাবলী সম্পর্কে বলেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, শ্রীরাম তাঁর ভাই ভরতকে অনুভবী ছাড়া ভাবেননি।

সমস্ত কথোপকথনে ভরতের প্রতি রামের ভালোবাসা ও বিশ্বাস স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। শ্রীরাম ভরতকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি কি সদা সন্তুষ্ট, সাহসী ধৈর্যশীল, বুদ্ধিমান, শুদ্ধ মহৎ ও আত্মবিশ্বাসী, যুদ্ধে দক্ষ পরাক্রমশালী একজন পুরুষকে তোমার প্রধান সেনাপতি বানিয়েছ?' আমার প্রধান প্রধান যোদ্ধা বলবান, যুদ্ধকুশল ও পরাক্রমী তাই তো? তুমি কি তাদের সাহসিকতার পরীক্ষা নিয়ে থাকো? তুমি কি তাদের যথাযোগ্য সম্মানে সম্মানিত করে থাকো? শুধু সেনাপতিই নয়, সৈন্যদের সঙ্গে রাজার কেমন আচরণ করা উচিত তাও শ্রীরাম ভরতকে বলেন, 'সৈন্যদের প্রাপ্য বেতন, ভাতা তুমি কি সময়মতো দিয়েছো, দিতে দেরি হয় না তো? সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর যদি বেতন, ভাতা দেওয়া হয়, সৈন্যরা তাদের মালিকের উপর অতিরিক্ত আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে এবং এর ফলে একটি বিশাল বিপর্যয় ঘটে।

শ্রীরাম ভরতকে পররাষ্ট্রনীতি ও গুপ্তচর বৃত্তির কথাও বলেন। একজন রাষ্ট্রদূত কেমন হওয়া উচিত, 'ভরত! তুমি যাকে রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করেছ সে তো এই দেশেরই বাসিন্দা? একজন পণ্ডিত, দক্ষ ও প্রতিভাবান, বিবেক যুক্ত মানুষ সে কিনা অন্যদের সামনে সেই একই কথা বলে থাকে যা তাকে বলে দেওয়া হয়েছিল, তাই না?' তিনি ভরতকে গুপ্তচরের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথাও বলেছিলেন। শুধু শত্রুপক্ষের নয়, তার রাজ্যের সেনাপতি, দারোয়ান, নগরপাল, কারারক্ষী, মহাজন, মামলার বাদী-বিবাদীর কাছ থেকে জেরাকারী আইনজীবী, বিচারক, সেনাপতি, কর্মচারীদের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর রাজার কাছ থেকে অর্থ নিয়ে তাদের বেতন দেওয়ার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি, নগর সভাপতি, জাতীয় সীমান্তরক্ষী ও বনরক্ষী, দুষ্টদের শাস্তি দেওয়ার জন্য আধিকারিক এবং জল রক্ষাকারী, পাহাড় বন ও দুর্গম জমির রক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তির উপর রাজার দৃষ্টি থাকতে হবে। একইভাবে, শত্রুপক্ষ ছাড়াও সকল বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য গুপ্তচরের ব্যবস্থা থাকা উচিত। মন্ত্রী, পুরোহিত এবং যুবরাজের উপরও গুপ্তচরদের নজর থাকা উচিত। 'যারা কৃষি ও ব্যবসা করে তাদের দেখাশোনা করা রাজার জন্য আবশ্যক। কারণ এর দ্বারা প্রজারা সুখ ও সমৃদ্ধি লাভ করে।' শ্রীরাম ভরতকে জিজ্ঞেস করেন, ভাই! সমস্ত বৈশ্য যারা কৃষি ও গোরক্ষা থেকে জীবিকা নির্বাহ করে তারা তোমার ভালোবাসার যোগ্য, তাই না? কারণ রাজাদের উচিত তাদের রাজ্যে বসবাসকারী সমস্ত লোককে তাদের ধর্ম অনুসারে লালন পালন করা। কাকে কোন কাজ দেওয়া উচিত, বিচার ব্যবস্থা কেমন হওয়া উচিত, নিরপরাধের শাস্তি হওয়া উচিত নয়, দুর্নীতিবাজের উচ্চপদে থাকা উচিত নয়, প্রজাদের প্রতি রাজার আচরণ এবং রাজার প্রতি প্রজাদের আচরণ কী হবে শ্রীরাম ভরতকে তাও ব্যাখ্যা করেন। □

অযোধ্যা রামমন্দির—ভারতবাসীর অস্মিতা প্রতিষ্ঠা

অধ্যাপক দেবাশিস চট্টোপাধ্যায়

অযোধ্যায় শ্রীরামজন্মভূমির ভূমিপূজন (জানুয়ারি ২০২০), প্রভুরামের প্রাণপ্রতিষ্ঠা (জানুয়ারি ২০২৪) সারা বিশ্বের বিশেষ করে ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী শক্তি ও সংস্কৃতি, সভ্যতা, আধ্যাত্মিক ভাবধারা, সংস্কার যুক্ত জীবনশৈলী, মানবতাবাদী জীবন দর্শনের এবং ঐতিহ্যের কালজয়ী উজ্জ্বল নিদর্শন। মর্যাদাপুরুষোত্তম শ্রীরামের প্রাণপ্রতিষ্ঠাকে ঘিরে বিশ্বজুড়ে উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং চর্চা শুরু হয়েছে। উদ্বোধনের অনেক আগেই রামমন্দির সারা বিশ্বের মিডিয়া ও সংবাদপত্রের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। ভারতবর্ষের মানুষের হৃদয়ে ক্রমশ জায়গা করে নিচ্ছে রামভক্তির শাশ্বত ভাবনা। রামবিরোধী দলগুলি (সিএএ বিরোধী-অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গা প্রেমী) ক্রমশই কোণঠাসা হচ্ছে। পৃথিবীজুড়ে রামমন্দিরকে নিয়ে নতুন ধর্মীয় ল্যান্ডস্কেপ তৈরি হচ্ছে যা আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক মেরুকরণে নতুন মাত্রা এনে দেবে। যা বিদেশ নীতিকে সম্ভাব্যভাবে প্রভাবিত করবে এবং ভারতবর্ষ ক্রমশ 'বিকশিত ভারতে' পরিণত হবে। তাই বিশ্বজুড়ে বিশেষ করে উত্তর-পূর্ব এশিয়ায় নতুন করে রামকে নিয়ে জানার ইচ্ছে ও আগ্রহ ক্রমশ বাড়ছে। নতুন প্রজন্মের কাছে বিশেষ করে প্রবুদ্ধ সমাজ ও সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোচনা ও চর্চার বিষয় হয়ে উঠছে। নতুন প্রজন্ম রামমন্দির নিয়ে চর্চায় খুবই উৎসাহী। উল্লেখযোগ্য হলেন ড. সুনীল যোগী যার ভজন সারা ভারতবর্ষে সাড়া ফেলে দিয়েছে।

শ্রীরামজন্মভূমি কয়েক শতাব্দী প্রাচীন সংঘর্ষ ও সংগ্রাম যার বর্তমানে পরিসমাপ্তি ঘটেছে। উল্লেখযোগ্য হলো, ১৯৮৯-এর ৯ নভেম্বর ডোম সমাজের কামেশ্বর চৌপালের দ্বারা মন্দিরের প্রথম শিলান্যাস হয়। সেই দিনই বার্লিন প্রাচীরও ধসে পড়ে। ইতিহাসের কী সন্ধিক্ষণ, জানি না কোনো জ্যোতিষী এর দিনক্ষণ ঠিক করেছিলেন কিনা। কিন্তু রাজনৈতিক ইতিহাসে নিঃসন্দেহে এটি একটা সন্ধিক্ষণ— একই দিনে ভারতে জাতীয়তাবাদী শক্তির পুনরুত্থান, অযোধ্যায় রামমন্দিরের শিলান্যাস এবং ইউরোপে (৫০০০ মাইল দূরে) বামপন্থী সৌধের পতন।

ভারতের বিভিন্ন প্রধানমন্ত্রী (ভিপি সিংহ, চন্দ্রশেখর, পিভি নরসিমা রাও) রামমন্দিরের ফয়সালার রাজনীতিতে সক্রিয় হন। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ভি পি সিংহ (১৯৮৯-৯০) সচেষ্ট হন রামমন্দির আন্দোলনের নিষ্পত্তির জন্য। তিনি বিশ্ব হিন্দু পরিষদকে শিলান্যাস করার

জন্য জমি দিতে প্রস্তুত হন (১৯ অক্টোবর, ১৯৮৯)। তারপর মুসলমান পক্ষের চাপে মত পরিবর্তন করেন। সেই রাত্রেই অর্ডিন্যান্স জারি করে এলাকাকে কেন্দ্রীয় সরকার অধিগ্রহণ করে। মুসলমান পক্ষ চারদিন পর এর বিরোধিতা করে এটাকে ওয়াকফ বোর্ডের সম্পত্তি বলে দাবি করে। ভিপি সিংহ সরকার পিছিয়ে যায় এবং রাষ্ট্রপতির আজ্ঞা অনুসারে অর্ডিন্যান্স তুলে নেওয়া হয়। কারণ মুসলমান ভোটব্যাংক জানিয়ে দেয় তারা আগামী নির্বাচনে তাদের পরিত্যাগ করবে। রামজন্মভুমি-বাবরি মসজিদ আলাপ আলোচনা ভেস্তে যায়। দেশে সংখ্যালঘু তোষণের রাজনীতি শুরু হয়ে যায়।

রামমন্দির ও রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা নিয়ে সারাদেশে রামভক্তদের উৎসাহ এখন তুঙ্গে। সারাদেশ এখন রামময়। এদিকে পশ্চিমবঙ্গে মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন মমতা ব্যানার্জি সংহতি যাত্রা করবেন বলে শোনা যাচ্ছে। রামমন্দির আসলে ভারতবাসীর অস্মিতার প্রতীক। সেই কারণেই ভারতীয় জনতা পার্টি ভারতবর্ষের রাজনীতির সংস্কৃতিতে 'প্রভু শ্রীরাম'কে রাষ্ট্রীয় চেতনার প্রতীক হিসেবে তুলে ধরেছে। তাই মোদীকে বিভিন্ন জনসভায় বলতে শোনা যায় মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামই ভারতবর্ষের প্রাণ, চেতনা ও প্রেরণা। প্রভু রামই প্রকৃত সমাজ সংস্কারক এবং সমরসতার প্রতীক।

উদ্বোধনের অনেক আগেই রামমন্দির সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সারা বিশ্বের মিডিয়া ও সংবাদপত্রের মনোযোগ এখন অযোধ্যায়। আধুনিকতার চাদরে মোড়া অযোধ্যার নগরায়ন সারা বিশ্বকে 'এক ভারত-শ্রেষ্ঠ ভারতের' বার্তা দেবে। বিশ্বের পর্যটন শিল্পে এক বড়ো বিপ্লব আনবে। ভারতের নিজস্ব প্রযুক্তি এবং কলাকৌশলে নির্মিত অযোধ্যার রামমন্দির এক উজ্জ্বল নিদর্শন হবে আধুনিক বিশ্বে।

বিশেষজ্ঞদের মতে প্রাণ প্রতিষ্ঠার দিন ৫০ হাজার কোটি টাকার ব্যবসা হবে। যার একটা বড়ো অংশই বিদেশি মুদ্রা (৪ মিলিয়ন ইউএস ডলার)। অযোধ্যা রামমন্দিরকে ঘিরে যে অর্থনৈতিক বাজার তৈরি হবে তা বিকশিত ভারত (ফাইভ ট্রিলিয়ন এর অর্থনীতি) গড়তে অনেকটাই সাহায্য করবে। রামমন্দিরকে কেন্দ্র করে হিন্দু অস্মিতার যে জাগরণ শুরু হয়েছে বিশেষজ্ঞদের ধারণা বহু দেশেরই নির্বাচনের ফলাফল পালটে দিতে পারে। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের মান, মর্যাদা, প্রভাব, ক্ষমতা বিশ্বের দরবারে আরও মজবুত হবে।

অযোধ্যায় রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা শুধু ভারতবর্ষের কাছে নয়, বিশ্বের কাছে ভারতবাসীর অস্মিতার প্রতীক। বর্তমান প্রজন্ম বিকশিত ভারত গড়ার সংকল্প নিয়েছে। 'দেশ সর্বোপরি'র ধ্বজা সর্বত্র উড়ছে। যাকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য শতাব্দীর পর শতাব্দী অত্যাচার, অবিচার চালানো হয়েছে, কিন্তু আজ সারা বিশ্বের হিন্দু রামমন্দিরকে কেন্দ্র করে এক ছাতার তলায় একত্রিত হয়ে দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করছে 'হিন্দু এবং হিন্দুত্ব— সনাতন এবং অমর'। রামমন্দির কেবলমাত্র একটি মন্দির নয়, এই মন্দির ভারতীয়দের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, সভ্যতা, ধর্ম, আধ্যাত্মিক ভাবধারা, সংস্কারিত জীবনশৈলী ও মানবতাবাদী দর্শনের উজ্জ্বল প্রতীক। □

মোদী সরকার কৃষকের প্রকৃত বন্ধু

আশা করা যায় নতুন সরকার কৃষকদের যাবতীয় সমস্যা বিবেচনা করে আগামী দিনে একটি আদর্শ কৃষিনীতি গ্রহণ করবে এবং গ্রাম-ভারতের সঙ্গে গ্রামবাঙ্গলাকেও এগিয়ে নিয়ে যাবে।

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

আমরা চব্বিশে চাই সোনার ভারত আর রাম রাজ্য। অর্থাৎ সুশাসন চাই এবং চাই দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন প্রশাসক। এখন 'সোনা' বলতে কী বুঝি? সোনা মানে 'উত্তম', সোনা মানে 'শ্রেষ্ঠ'। চর্যাপদে পাচ্ছি— 'সোনা ভরিতী করুণা নাবী/রূপা থোই নাহিক ধাবী।' আমার সোনায় নৌকো ভরেছে, রুপার জন্যও আর স্থান নেই। আমরা বলি 'সোনার ছেলে', 'সোনার মেয়ে'। লৌকিক ছড়ায় শিশু হয়ে যায় 'সোনা'। সেরকমই সোনার মাটি, সোনার ফসল, সোনার গৌর। তেমনই 'সোনার দেশ', 'সোনার ভারত'। এক সমৃদ্ধ ভারত, জগৎ সভার এক শ্রেষ্ঠ আসন। এই সোনার দিব্যানুভূতি বুঝতে গীতাঞ্জলির 'কৃপণ' কবিতাটি মনে করা যেতে পারে।

এবার ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আবহে চিত্রকল্পটি স্মরণ করুন। এক সন্ততুল্য রাষ্ট্রনায়ক উন্নয়নের দিগ্‌বিজয় রথ নিয়ে বিশ্বজয় করে রাজ্যে রাজ্যে প্রবেশ করছেন। উন্নয়নহীন 'বিশ্ববাংলা'-য় এসে ১০০ দিনের ভিক্ষা পাওয়া বাঙ্গালি, ভিক্ষার চালে ঝুলি ভরানো বাঙ্গালি, পরিযায়ী শ্রমক্লিষ্ট বাঙ্গালি চালচোরেদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। উন্নয়ন না করে এ রাজ্যে শাসক ভিখারি বানানোর তোড়জোড় করেছে। রাজ্যে শিক্ষা নেই, উন্নয়ন নেই, কর্মসংস্থান নেই, শিক্ষান্তে চাকরি নেই, শিল্প নেই, সংস্কৃতি নেই, ঘুষের দামে মেধার মূল্য নেই। বেকারি, বে-রোজগারে অন্ধ ভিখারিরা চারিদিকে গিজগিজ করে বেড়াচ্ছে। চোখে 'জয় বাংলা' হয়েছে মানুষের। আক্রান্ত চোখে সত্যকে দেখতে না পেয়ে ন্যাবা রোগ ধরেছে রাজ্যকে। ঘুষপেটি রোহিঙ্গার দল আগাছার মতো ঢুকেছে মালঞ্চে। কুসুমোদ্যানে অবৈধ অনুপ্রবেশে ছারখার বঙ্গভূমি। চারিদিকে ভয়ানক জতুগৃহ, ফতোয়ার ফন্দি। খাগড়াগড় বিস্ফোরণ, দেগঙ্গা, উস্থি, মন্দিরবাজার, কালিয়াচক, জুরানপুর, হাজিনগর, ধুলাগড়, সন্দেশখালি এরকম অসংখ্য নাম। মা-বোনেদের লাঞ্ছনা। রাজ্যের মানুষ অজানা ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত। এমনই ভিক্ষালব্ধ ধনে প্রতিপালিত হতে বাধ্য হওয়া ভিখারি-নাগরিক চারিদিকে। এই রাজ্যের ভিখারি ভাবছে, ভরতুকির স্বর্ণরৌপ্য মুঠো মুঠো ছড়িয়ে দেবেন গোল্ডেন চ্যারিয়টের দেবতা, নরেন্দ্র। 'স্টিকার দিদি' পশ্চিমবঙ্গের নামে নিজের লেবেল বসিয়ে কাউকে কাউকে উপঢৌকন দেবেন। ভিখারি বিনা আয়েসে, খেলা-মেলার সরকারের দাক্ষিণ্য কুড়িয়ে নেবে বঙ্গভূমে বসেই।

কিন্তু না! সেই ঐশীরথ ভিখারির পাশে এসে থেমে গেল। সাধু নামলেন। বিশ্ববরেণ্য নেতার পদে আসীন তিনি। সাংগঠনিক শক্তির অপরূপ সৌকর্য, মনের সৌন্দর্য তাঁর মধ্যে। রাজভিখারি নরেন্দ্র এসে বোধ হারানো, বিবেক হারানো, বিকিয়ে যাওয়া মনের কাছে ভিক্ষা চাইলেন। দেশ গড়ার ভিক্ষা, উন্নয়নের যজ্ঞ সংগঠিত করার ভিক্ষা। অন্যায় অবিচার দূর করার ভিক্ষা। অপশাসন দূর করার ভিক্ষা।

এটাই কি ভোট ভিক্ষা! যদি মনে করেন সমগ্র দেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গও রিকনস্ট্রাকশন করার ভিক্ষা, তবে তাই! যদি মনে করেন বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা বাঙ্গালি প্রজাতির দিল্লি যাত্রার শুল্ক, তবে তাই! অন্তরকে পুরোপুরি দান না করলে সোনার ভারত হয় না। সোনার বাংলাও হয় না। অন্তর উজাড় করে সবটুকু দিতে না পারলে দেশ সোনার হয় না। 'জয়

বাংলা'র জীবাণুতে আক্রান্ত চোখ নিয়ে ভিক্ষার সংজ্ঞা-স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য ধরতে পারবো না। বুঝতে পারবো না স্বর্ণবঙ্গ করে দেবার জন্যই আমার কাছে হাত পেতেছেন প্রধানমন্ত্রী। ২০২১-এ আমরা তাঁকে ভিক্ষা দিইনি। তার ফল আমরা হাতে গরম পেয়েছি। ক্ষণিকের দ্বিধায়, কুড়ি টাকার পাউচের নেশায়, ৫০০ টাকার ভিক্ষাশ্রীতে, ভোটপর্বের ডিস্তাতে যদি আকুল হই, তবে ভুল হয়ে যাবে আমার জীবন, আমার পরবর্তী প্রজন্ম, আমার উত্তরাধিকার, আমার ঐতিহ্য, আমার লোকসংস্কৃতি।

তাই চাকরি চুরি, কয়লা চুরি, গোরুচুরির রাজ্যে ২০২৪-এর লোকসভা ভোটে সমস্ত ভিক্ষাকণাগুলি অর্থাৎ আমাদের মতদানগুলি সোনা করে নেবার সুযোগ আমি হাতছাড়া করবো না। সরকার গড়তে দিল্লিগামী-শকটে আমার সাংসদ, আমার সামর্থ্য, আমার অন্তরাত্মা, আমার আকাঙ্ক্ষা, আমার শক্তি যোগদান করবে ভারত নির্মাণে। আর এটাই হবে প্রকৃত 'যোগদান মেলা'। রাজা নরেন্দ্রর উন্নয়ন পরিকল্পনা।

বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়ন-মন্ত্র, 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্রয়াস।' অর্থাৎ সকলকে নিয়ে চলা, সকলের সঙ্গে চলা, সকলের বিশ্বাস-আস্থা অর্জন রা এবং সকলকে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞে শামিল করা। ভারতবর্ষের গরিব, গ্রামীণ প্রান্তিক মানুষের জন্য সেবা, সুশাসন ও কল্যাণের যে কর্মসূচি মোদী সরকার বিগত বছরগুলিতে গ্রহণ করে এসেছে, তার সুফল আরও অধিক কৃষকের কাছে পৌঁছে দেবার নামই উন্নয়ন। কৃষক-কেন্দ্রিক প্রকল্প রূপায়ণে কৃষকের আস্থা অর্জন সবচাইতে বড়ো কাজ।

একনজরে দেখে নেবো গরিব মানুষের জন্য মোদী সরকার কী কী করেছেন!

১. আশি কোটি মানুষ বিনামূল্যে পেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনায়।

২. প্রায় বারো কোটি বাসিন্দার কাছে পৌঁছে গেছে কলের জল।

৩. তিন কোটির অধিক মানুষ গ্রামে ও শহরে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় গৃহলাভ করেছেন।

৪. প্রায় বারো কোটি শৌচাগার তৈরি হয়েছে স্বচ্ছ ভারত প্রকল্পে।

৫. প্রায় পয়ত্রিশ লক্ষ রাস্তার হকার PM SVANidhi প্রকল্পে ঋণ পেয়েছেন।

৬. প্রায় চল্লিশ কোটি ঋণ আবেদন মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোগপতিদের জন্য মঞ্জুর করা হয়েছে।

৭. সাংবিধানিক স্ট্যাটাস দেওয়া হয়েছে ন্যাশানাল কমিশন অব ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসকে।

৮. প্রায় কুড়ি কোটি মহিলার কাছে করোনা পরিস্থিতিতে অর্থ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

৯. স্ট্যান্ডআপ ইন্ডিয়া প্রকল্পের মাধ্যমে ৭৩৫১ কোটি টাকা তফশিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ ঋণ পেয়েছেন।

১০. বর্তমান ভারতবর্ষে ৬০ শতাংশ মন্ত্রী এস.সি.এস.টি. বা ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্ত।

১১. ২০১৪ সালের আগে যত না একলব্য আবাসিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার চাইতে ৫ গুণ বেশি বিদ্যালয় তৈরি হয়েছে ২০১৪ সালে মোদী সরকার আসার পর।

১২. বিভিন্ন প্রদেশ মিলিয়ে ১১৭টি অ্যাসপিরেশনাল জেলা গঠিত হয়েছে উন্নয়নের নিরিখে। এরকম আরও অনেক কাজের ফিরিস্তি দেওয়া যেতে পারে।

কীভাবে প্রান্তিক মানুষের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে তার একটি প্রাসঙ্গিক তালিকা দেওয়া হলো :

১. যে সমস্ত দরিদ্র কৃষক প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনার আওতায় আছেন, তার ৭১ শতাংশই এস.সি./এস.টি./ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্ত।

২. পিএম কিষাণ প্রকল্পের মাধ্যমে উপকৃত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের মধ্যে ৮০ শতাংশ এস.সি./এস.টি./ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্ত।

৩. যে গৃহ যেগুলি PMAY(G) প্রকল্পে নির্মিত হয়েছে তার ৪৫.৪৫ শতাংশ পেয়েছেন এস.সি. অথবা এস.টি. সম্প্রদায়ভুক্তরা। স্কলারশিপ গ্রহীতাদের ৫৮ শতাংশ এস.সি./এস.টি./ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্ত।

৪. চল্লিশ কোটি মুদ্রা যোজনায় সুবিধাপ্রাপ্ত মানুষের ৫১ শতাংশ এস.সি./এস.টি./ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্ত।

কৃষকের মঙ্গলের জন্য নিয়োজিত এই সরকারের যদি বিগত দিনের কাজ ও বর্তমান সময়ের পরিকল্পনার হদিশ করি, তবে দেখবো কত বৃহৎ ও ব্যাপক উন্নয়নের প্রচেষ্টা করেছে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার।

১. ২০১৩-১৪ সালের চাইতে ২০২২-২৩ বর্ষে ৫.৭ গুণ বাজেট বরাদ্দ কৃষিতে বেড়েছে।

২. কৃষি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফান্ডে অর্থ বরাদ্দ হয়েছে ১ লক্ষ কোটি টাকা।

৩. ১১ কোটির অধিক কৃষক পিএম কিষাণ প্রকল্পে উপকৃত হয়েছেন।

৪. প্রায় ২৩ কোটি সয়েল হেলথ্ কার্ড বা মৃত্তিকা স্বাস্থ্যের বিবরণী নথি বিতরণ করা হয়েছে, যা থেকে মাটির গুণগত মান জানতে পারবেন কৃষকেরা এবং তার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সার প্রয়োগ করতে সমর্থ হবেন।

৫. ২০১৩-১৪ সালের চাইতে ২০২১-২২ অর্থবর্ষে নন-বাসমতি চাল রপ্তানি ১০৯.৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

৬. তৈলবীজের ক্ষেত্রে মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস কৃষকদের প্রদান করে যে সংগ্রহ অভিযান চলেছে, তা ১৫০০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে দেশে তৈলবীজ উৎপাদন প্রভূত বৃদ্ধি পেয়েছে।

৭. ডালশস্যের ক্ষেত্রে মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস কৃষকদের প্রদান করে যে সংগ্রহ অভিযান চলেছে, তা ৭৩৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে দেশে প্রোটিন সমৃদ্ধ আহার ডালচাষ বৃদ্ধি পেয়েছে।

৮. ২০২১-২২-এর চাইতে ২০২২-২৩ বর্ষে সারে ভরতুকি বেড়েছে ৫০০ শতাংশ।

৯. ২০২৩-২৪ বর্ষে কৃষি খাতে ঋণদানের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে ২০ লক্ষ কোটি টাকা।

১০. প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা খাতে ১.৩৩ লক্ষ কোটি টাকার দাবি মঞ্জুর করা হয়েছে। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক বিমার টাকা পেয়ে ক্ষতি সামলাতে পেরেছেন।

১১. চাষ করতে লাগে জল। ২০২১-২৬ এই পাঁচ সালের জন্য প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঁচাই যোজনা বা সেচের জল জোগানের পরিকল্পনায় ৯৩.০৬৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

১২. ই-নাম (eNAM) প্রকল্পের আওতায় ১,২৬০টি মান্ডি এসেছে এবং কৃষি সামগ্রী বেচা-কেনা কাজে গতি এসেছে।

কৃষি উন্নয়নের নিরিখে বর্তমান সরকারের যে কথাগুলি মানুষ মনে রাখবে, তা হলো :

১. ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষেত্রে কৃষককে রক্ষা করা ও আগলে রাখার মানসিতা এই সরকারে পুরোদমে রয়েছে।

২. MSP বা মিনিমাম সাপোর্টিং প্রাইস বৃদ্ধি করেছে এই সরকার। খরচের ৬০ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি করে ধার্য করা হয়েছে ফসল বিক্রির ন্যূনতম মূল্য, যাতে অভাবী বিক্রি করে দিতে বাধ্য না হয় চাষি, ফসল চাষ করে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে।

৩. পিএম কিষাণ প্রকল্পে ১১ কোটির বেশি কৃষক প্রত্যেকে বছরে ৬ হাজার টাকা পাবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আশ্বস্ত হয়েছে। এ বড়ো কম কথা নয়। চাষ করে, ফসল বিক্রি করে লাভ তো আছেই, বিমা করা আছে ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হলে। তার উপর বছরে এই অতিরিক্ত নিশ্চিত টাকা কৃষককে চাষের মধ্যে থাকতে আশ্বস্ত করেছে।

৪. শাস্ত্রে আছে 'কৃষিমিৎ কৃষস্ব' অর্থাৎ চাষই কেবল করো। এটাই কৃষককে সম্মান জানানোর জন্য সরকারি প্রচেষ্টা। ফসল বিমার যে বন্দোবস্ত কেন্দ্রীয় সরকার করেছে, তার জন্য প্রিমিয়ামের পরিমাপ যৎসামান্য। অথচ ফসল ফলাতে গিয়ে নানাভাবে চাষ মার খেলে কৃষক তার প্রাপ্য টাকা ফসল বিক্রি ছাড়াই পেয়ে যাবেন। ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা খাতে ১.৩৩ লক্ষ কোটি টাকা কৃষকের দাবি সরকার মেনে নিয়েছে। বিমার টাকা পাবার পথ আরও সহজ ও সাধাসিধে হয়েছে।

৫. একটি প্রবাদ আছে 'আশায় মরে চাষা'। বৃষ্টির জন্য প্রকৃতির দিকে চেয়ে থাকতে হতো। সব জায়গায় তো আর বড়ো নদী পরিকল্পনায় সেচের জলের সুবিধা নেই! বৃষ্টির উপর থেকে নির্ভরতা কমিয়ে দিতে পেরে কৃষিকাজকে নিশ্চিত করেছে এই সরকার। যদিও অন্য পরিকল্পনায় বর্ষার জল ধরা ও জল ভরার প্রাকৃতিক প্রকল্পের সদ্ব্যবহারও রয়েছে। মোট ৬৬,৫৯৫ কোটি টাকা নিয়োজিত করে ৯৯টি ইরিগেশন প্রকল্প হাতে নিয়েছে এই সরকার, যা কৃষিক্ষেত্রে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পে যুগান্তকারী উদ্যোগ।

৬. সর্বকালের জন্য সবচেয়ে বেশি খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়েছে এই আমলেই। ২০১৩-১৪ সালে যেখানে ২৬৫.০৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়েছিল, ২০২২-২৩ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩২৩.৫৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশ হয়ে উঠেছে ভারতবর্ষ। কৃষিক্ষেত্রে সর্বোত্তম গরিমাময় একটি দেশ।

৭. কৃষকের এখন আয় বৃদ্ধির নানান পথ খুলে দেবার চেষ্টা করছে এই সরকার। ব্যারেন ল্যান্ড বা পতিত অকর্ষিত জমিতে সৌর প্যানেল বসিয়ে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থাএক উৎসাহিত করা হচ্ছে।

৮. চেষ্টা চলছে দুধ উৎপাদন বাড়িয়ে চাষির আয় বাড়াতে। ২০১৪-১৫ সাল থেকে ২০২১-২২ সালে বার্ষিক দুধ উৎপাদন বেড়েছে ৫১.০৫ শতাংশ।

৯. মৎস্য উৎপাদন বাড়াতে পৃথক মন্ত্রক তৈরি হয়েছে। যথার্থ 'নীল বিপ্লব' (Blue Revolution) আসবে এই মৎস্য উৎপাদন বাড়িয়ে।

১০. বিগত ৯ বছরে মধু উৎপাদন শুধু বেড়েছে তাই নয়, বিদেশে রপ্তানির পরিমাণ দ্বিগুণ হয়েছে। একেই বলা যায় মিষ্টি বিপ্লব (Sweet Revolution)।

১১. ২০১৩-১৪ সালের চাইতে ২০২১-২২ সালে কৃষিক্ষেত্রকে কাজে লাগিয়ে ইথানল তৈরির পরিমাণ ৩৮ কোটি লিটার থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৩৪ কোটি লিটার।

১২. রাষ্ট্রসঙ্ঘ ২০২৩ সালকে International Year of Millets বা আন্তর্জাতিক মোটাদানা শস্যের বছর বা শ্রীঅন্ন বছর বলে চিহ্নিত করেছে। এই কোর্স গ্রেইন বা মোটা দেশীয় দানাশস্যের মধ্যে প্রভূত পুষ্টিমূল্য রয়েছে, যা দেশের পুষ্টি নিরাপত্তার জন্য একটি দারুণ উৎস। এগুলি সাধারণ মানুষের ফসল, এগুলিকে বিশ্বের বাজারে ছড়িয়ে দিতে প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার। ভারতবর্ষ এই উদ্যোগের একটি উল্লেখযোগ্য দেশ। কারণ বহু বিচিত্র মোটাদানার শ্রীঅন্ন যেমন জোয়ার, বাজরা, রাগি, কোদো, মারুয়া ভারতে উৎপন্ন হয়। এই প্রস্তাব রাষ্ট্রসঙ্ঘে ২০২১ সালের মার্চ মাসে ভারতই উত্থাপিত করে এবং ৭২টি দেশ তা সমর্থন করে। এভাবেই ২০২৩ সালে পালিত হয়েছে মিলেট বর্ষ বা শ্রীঅন্ন বর্ষ। গরিব মানুষকে তাদের হাতের নাগালে থাকা পুষ্টিকর শস্য-সম্পদে ভরিয়ে দিতে হবে গোলা।

২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কৃষি বিষয়ক তিনটি বিল লোকসভা ও রাজ্যসভায় পেশ ও উত্তীর্ণ হয়ে, ভারতের রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পেয়ে আইনরূপে বলবৎ হয়েছিল। পরে তা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রত্যাহৃত হয়। আইনগুলি ছিল— ১. কৃষি পণ্য ব্যবসা-বাণিজ্য (উৎসাহিত ও প্রতিশ্রুতি) আইন বা FPTC Act, ২. কৃষক (ক্ষমতায়ন ও রক্ষা) মূল্য নিশ্চতকরণ এবং কৃষিপরিষেবা আইন বা FAPAT Act, এবং ৩. অত্যাবশ্যকীয় পণ্য (সংশোধনী) আইন বা ECA Act। এই আইনগুলি চালু হলে বাজারের প্রথাগত প্রাঙ্গণের বাইরে বাধাহীন হতো অন্তর্রাষ্ট্রীয়

এবং আন্তর্রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য। কৃষকদের সরাসরি বিপণনে জড়িত হতে সাহায্য করতো এই আইন, মধ্যস্থতাকারীদের অবস্থানও দূর করতো, ভারতের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতো। কৃষি বিপণন ব্যবস্থায় এক ব্যাপক পরিবর্তনের ফলে পরিকাঠামোগত বেসরকারি বিনিয়েগের সম্ভাবনা প্রবল হতো। গ্রামে গ্রামে কোল্ড স্টোরেজ, গুদামঘর ইত্যাদি তৈরি হতো এরই ফলশ্রুতিতে।; আর প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এপিএমসিগুলি বা Agricultural Produce Market Committee-গুলি কৃষকদের আরও সুবিধার বন্দোবস্ত করতে বাধ্য হতো।

প্রতিক্রিয়াশীল চক্র কৃষি আইনের বিরোধিতা করছিল। যে কৃষি বিল চাষির জন্য আশীর্বাদ হতে পারতো, তার বিরোধিতা কেন করা হলো? বিষয়টি দাঁড়িয়ে ছিল দুটি মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর, কেউ কৃষকের অর্থ দেখছেন না মধ্যস্বত্বভোগীদের স্বার্থের কথা ভাবছেন। কৃষকের জন্য কেউ মায়াকান্না কেঁদে দালালদের জন্য কৃত্রিম প্রেম দেখিয়েছিলেন। তারা দেশের ক্ষুদ্র-প্রান্তিক চাষির কথা ভাবেননি, জোতদার শ্রেণীর কৃষকের কথা ভেবেছেন। তারা দুই এক বিঘা জমির মালিক এমন কৃষকের জন্য কুম্ভীরাশ্রু ফেলে কয়েকশো বিঘা যাদের তাদের স্বার্থ দেখেছেন এবং কৃপাদৃষ্টি করেছেন। বাংলায় একটি প্রবাদ আছে, তা হলো, 'সে কহে অধিক মিছে যে কহে বিস্তর।'

সেই কৃষি আইনে কৃষিপণ্য ব্যবসা-বাণিজ্যে এমন একটি তন্ত্র রচনার বন্দোবস্ত ছিল যেখানে কৃষক ও ব্যবসায়ী কৃষিপণ্যের ক্রয়বিক্রয় সংক্রান্ত যাবতীয় স্বাধীনতা ভোগ করতে পারতেন, আগে যেটা ছিল না। মান্ডিতে ফসল বিক্রি করতে গিয়ে যদি কৃষক মনে করতেন তিনি প্রতারিত হচ্ছেন, যথাযথ দাম পাচ্ছেন না, তাহলে বিকল্প ব্যবস্থা তার জন্য খোলা ছিল। প্রতিযোগিতার এক নতুন ও অন্যতর মার্কেটিং চ্যানেল তৈরির সুযোগ ছিল। ছিল দক্ষ, স্বচ্ছ ও বাধাহীন প্রণালী। কৃষিপণ্যের অন্তর্রাজ্য বাণিজ্য সম্ভব ছিল। দৃশ্যমান বাজারের বাইরে বাজার-সদৃশ্য স্থল রচনা হতো। সম্ভব হতো বৈদ্যুতিন বাণিজ্য। আইনের মূল লক্ষ্যটি ছিল, সারা দেশের জন্য সুসংহত ও অভিন্ন একটি বাজার গড়ে তোলা— 'এক দেশ এক হাট'। কেন্দ্র সরকার চাননি কৃষক ও আমজনতার মধ্যে কাটমানি-খোর মধ্যস্বত্বভোগীরা এঁটুলি পোকার মতো লাভের গুড় খেয়ে ফেলুক। সেই আইনে কৃষক ফসল থেকে বেশি দাম পেত, লাভবান হতো। তেমনই সাধারণ মানুষ তুলনায় কমদামে ফসল কিনতে পেরে লাভবান হতেন। অর্থাৎ এটি ছিল যেমন কৃষক-বান্ধব আইন, তেমনই সাধারণ মানুষের সহায়ক আইন। তবে দালালদের সন্তুষ্টির আইন এটি ছিল না। কৃষিতে লাভ হয় না বলে, যে কৃষক চাষ ছেড়ে দিচ্ছেন, তার বিপ্রতীপে এই আইন কৃষককে জমিজিরেতের অভিমুখী করে তুলতে। মান্ডিতে বিক্রি করার জন্য যে শুল্ক লাগতো, এই আইনের ফলে আর লাগতো না। কেউ যদি মনে করতেন, তিনি লেভি দিয়ে মান্ডিতেই ফসল বিক্রি করবেন, তার সুযোগ কেড়ে নেওয়া হয়নি। অর্থাৎ যারা বলছেন, মান্ডি উঠে যাচ্ছে, তা কিন্তু নয়।

কৃষিবিল নিয়ে এই কট্টর বিরোধিতা কেনই-বা কেবলমাত্র পঞ্জাব, হরিয়ানা, পশ্চিম উত্তর প্রদেশের মতো স্থানে জন্ম নিল! কেনই-বা অবশিষ্ট ভারতে তার প্রভাব নেই? যে অঞ্চলের মানুষ আন্দোলন করলেন, সেই রাজ্যের কৃষকের গড় পারিবারিক আয় অন্য রাজ্যগুলি থেকে অনেক বেশি।

এদিকে এ রাজ্যে ৯৬ শতাংশ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি নিজেদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাদ্য উৎপাদন করলেও, তাদের গড়পড়তা বার্ষিক আয় মোটে আটচল্লিশ হাজার টাকা। ভারতীয় কৃষকের গড় আয় আটাত্তর হাজার টাকাও পশ্চিমবঙ্গের চাইতে বেশি। পশ্চিমবঙ্গের কৃষকের আয় ওড়িশা এবং ঝাড়খণ্ডের চাইতে কম।

রাজ্যে ফসল কাটার পর ব্যবস্থাপনার বিস্তর অভাব আছে, বিপণনের পরিকাঠামোগত সুযোগ নগণ্য। কৃষকের আয় দ্বিগুণ করা সম্ভব হবে, যদি নতুন কৃষি আইন দ্রুত চালু করে ফসলের সুনিশ্চিত দাম পাইয়ে দেওয়া যায়। সেই সঙ্গে রাজ্যের কৃষি ও আনুষঙ্গিক বিভাগগুলিকে সুষ্ঠু ও সমন্বিতভাবে কাজ করানো যায়। ফসল-প্রাণীসম্পদ-মৎস্য ভিত্তিক চিরায়ত কৃষিকর্মের পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায়। হাজার হাজার ফার্মার্স প্রোডিউসার্স অর্গানাইজেশন তৈরি হলে কৃষকদের একত্রিত করে ফসলের দাম পেতে দর কষাকষি সম্ভব হতো। এফপিও তৈরি করিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার সেই কাজটিই করতে চলেছেন। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের দারিদ্র্য মোচন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন তখনই হবে, যখন ফসলের বাজার তৈরি করা যাবে, ফসলের দাম পাওয়ার ব্যবস্থা হবে, ফসল লাগানোর সময়েই চুক্তিচাষে নিশ্চিত হওয়া যাবে কতটা মূল্য সে পেতে পারেই। কৃষি আইনে সে সুযোগ ছিল।

পশ্চিমবঙ্গের কৃষকসমাজের পরিচয় গ্রহণ করে নেওয়া যাক। এ রাজ্যের বড়ো অংশের মানুষের জীবনপথ হচ্ছে কৃষিকর্ম। খাদ্যোৎপাদন ও জীবনচর্যায় কৃষিই তাদের আশা, চাষাবাদই তাদের ভরসা। জমির মালিকানা আছে এমন কৃষকের পাশাপাশি গ্রামের হাজার হাজার ভূমিহীন-শ্রমিক কৃষিকাজকে জীবন ও জীবিকার জন্য বেছে নিয়েছেন। রাজ্যের জমির পরিমাণ এক হেক্টর বা সাড়ে সাত বিঘার কম এমন কৃষক রয়েছেন ৮২.১৬ শতাংশ, যাদের বলা হচ্ছে প্রান্তিকচাষি। ৫২.৪৭ শতাংশ ব্যবহারযোগ্য, জমি-জিরেতের মালিকানা তাদেরই হাতে। ১৩.৭৬ শতাংশ কৃষক মোটের উপর ক্ষুদ্রচাষি। তাদের মাথাপিছু জমির গড় পরিমাণ এক থেকে দুই হেক্টর। এরা রাজ্যের মোট চাষযোগ্য কৃষিজমির ২৮.২৫ শতাংশ দখল করে আছে। সবমিলিয়ে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক ৯৫.৯২ শতাংশ, তারা মোট ৮১ শতাংশ কৃষিজমির মালিক। ২০১০-১১ সালের জনগণনা অনুসারে ৭২ লক্ষ কৃষক পরিবার এ রাজ্যে বসবাস করেন। ধীরে ধীরে তাদের মাথাপিছু জমির পরিমাণ কমছে এবং চাষ থেকে আয়ের পরিমাপও কমে যাচ্ছে। রাজ্যের শস্য নিবিড়তা ১৮৫ শতাংশ। অর্থাৎ রাজ্যে গড়পড়তায় দুটি ফসলও চাষ হয় না। সেচের সুবিধাযুক্ত কৃষিভূমি মাত্র ৫৪ শতাংশ। শতাংশের উপর কৃষক পরিবারের বার্ষিক আয় ২.৪ লক্ষ টাকার বেশি। রাজ্যের একটি বড়ো এলাকা খরাপ্রবণ পশ্চিমাঞ্চলের অন্তর্গত। সেখানে ভূমিক্ষয় বড়ো সমস্যা। মাটির উর্বরা শক্তি একেবারেই কম। বৃষ্টিপাত কম এবং অনিশ্চিত।

এদিকে সুন্দরবন একটি পশ্চাৎপদ ব-দ্বীপ এলাকা। সেখানে সতেজ ও বিশুদ্ধ জলে সেচ দেওয়া মুশকিল। পার্বত্য ও তরাই অঞ্চলের মাটি ক্ষয়িষ্ণু ও অম্লধর্মী। তার উৎপাদিকা শক্তি কম। সেচের সুবিধা অপ্রতুল। ফলে এইসব অঞ্চলে প্রতিকূলতার জন্য দশকের পর দশক কৃষিকাজে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। এইসব অঞ্চলের অধিকাংশ কৃষককে খাদ্যের নিশ্চয়তা এবং জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা দেওয়া এক প্রবল সমস্যা। আশা করা যায় নতুন সরকার কৃষকদের যাবতীয় সমস্যা বিবেচনা করে আগামী দিনে একটি আদর্শ কৃষিনীতি গ্রহণ করবে এবং গ্রাম-ভারতের সঙ্গে গ্রামবাঙ্গলাকেও এগিয়ে নিয়ে যাবে। □

পশ্চিমবঙ্গেও রাম-লহর

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ কলকাতাতেও অযোধ্যার উচ্ছ্বাস। গত ২২ জানুয়ারি, রাম মন্দিরের প্রতিকৃতি সহকারে রাজপথে মিছিল করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। পোস্তার শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ মন্দির হতে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ স্থিত রামমন্দির পর্যন্ত মিছিলে অংশগ্রহণ করেন শুভেন্দুবাবু। মিছিলের মধ্যে গৈরিক পতাকা হাতে হাঁটতে দেখা যায় দেখা যায় বিরোধী দলনেতাসহ হাজার হাজার রামভক্তকে। মিছিলে পা মেলান সুকান্ত মজুমদার, রাহুল সিনহা, মীনাদেবী পুরোহিত -সহ অন্যান্যরা। মিছিলের ভিডিয়ো সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করে শুভেন্দুবাবু লিখেছেন, 'কলকাতায় গেরুয়া সুনামি। অযোধ্যা ধামের শ্রীরামজন্মভূমিতে ভগবান শ্রীরামের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকে সম্মান জানাতে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ মন্দির থেকে শ্রীরামমন্দির পর্যন্ত সনাতনী শোভাযাত্রা। কী দিন, কী মুহূর্ত! বহু শতাব্দী ধরে এই মুহূর্তটির জন্য আমরা অপেক্ষা করেছি। জয় শ্রীরাম।' শোভাযাত্রা শেষে পুজো দেন রামমন্দিরে। যোগ দিলেন অষ্টপ্রহর যজ্ঞে। সন্ধ্যারতি করলেন হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর ঘাটে। কলকাতায় লাইভ স্ট্রিমিঙের মাধ্যমে অযোধ্যায় রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার মুহূর্তের

সাক্ষী থাকলেন রাজ্যপাল ড. সিভি আনন্দ বোস। খড়্গপুর আইআইটিতেও অধ্যাপক-ছাত্র-গবেষকদের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা দেখা যায়। আইআইটি প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে নেতাজী ও কালিদাস অডিটোরিয়ামে তিল ধারণের স্থান ছিল না। জয়শ্রীরাম ধ্বনিতে মুখরিত ছিল ক্যাম্পাস।

গত ১৬ জানুয়ারি থেকে অযোধ্যায় শুরু হয় অনুষ্ঠান। ১০৮ ফুট লম্বা ধূপকাঠি জ্বালিয়ে শুরু হয় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার আচারবিধি পালনও। প্রথম দিনে হয় সরযূনদীর তীরে দশবিধ স্নান, প্রায়শ্চিত্ত ও কর্মকোটি পূজা। ১৭ জানুয়ারি শোভাযাত্রা সহকারে রামলালার মূর্তি সরযূর তীরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে অভিষেকের পর ফিরিয়ে আনা হয় মন্দিরে। ১৮ জানুয়ারি সন্ধ্যায় হয় তীর্থ পূজা, জলযাত্রা ও গন্ধ অধিবাস। বিগ্রহের অভিষেকে সব তীর্থের জল প্রয়োজন। সরযূ নদীর জল ঘড়া করে মন্দিরে এনে গর্ভগৃহ ধোয়া হয়। এখানে সরযূর জলই সব তীর্থের জল হিসেবে গণ্য হয়। পাশাপাশি গন্ধ অধিবাসে জলে বিভিন্ন ধরনের ধূপ-সুগন্ধ দেওয়া হয়। ওই দিনই গণেশ-বরুণ পূজা, মাতৃ (অম্বিকা) পূজা, বাস্তুপূজার মাধ্যমে মূল পুজোর অনুষ্ঠান শুরু হয়ে যায়। ১৯ জানুয়ারি মন্দিরে নবগ্রহ স্থাপন ও যজ্ঞের আগুন জ্বালানো হয়। পাশাপাশি ঔষধি অধিবাস, কেশর অধিবাস, ঘৃত অধিবাস ও ধান্য অধিবাস হয়। অধিবাসে উল্লেখিত দই, দুধ, ঘি, মধু ও শর্করা— পঞ্চ গব্য সহকারে বিগ্রহের অভিষেক হয়। ২০ জানুয়ারি মন্দিরে বাস্তু শান্তির পুজো এবং শর্করা অধিবাস, ফল অধিবাস ও পুষ্প অধিবাস হয়। ২১ জানুয়ারি রামলালার বিগ্রহকে স্নান করানোর পরে শুরু হয় বিশ্রাম। রাতে শয়ন অধিবাস। ২২ জানুয়ারি, ২০২৪, শাস্ত্রীয় বিধিনিয়ম মেনে পৌষ মাসের শুক্ল কূর্ম দ্বাদশী তিথিতে বিক্রম সংবৎ ২০৮০-র বৈকালিক অভিজিৎ মুহূর্তে (বেলা ১২টা বেজে ২০ মিনিটে) প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় রামলালার। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১১ দিন অনশন, সমস্ত সংযম বিধি পালন করে ২২ জানুয়ারি প্রাণপ্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানে অংশ নেন এবং শ্রীরামলালার বিগ্রহে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন।

অযোধ্যায় রাম-শরদ কোঠারির স্মৃতিতে সেবাকাজ

অযোধ্যার রামমন্দিরে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে কলকাতার রাম-শরদ কোঠারি স্মৃতি সঙ্ঘের উদ্যোগে অযোধ্যার টেড়ি বাজার চৌরাস্তার কাছে জলপান ব্যবস্থা শিবির স্থাপিত হয়। সঙ্ঘের তরফে রাজেশ আগরওয়াল জানান, গত ১৬-২৫ জানুয়ারি অযোধ্যায় আগত রামভক্তদের জন্য চা-বিস্কুট-নিমকি ইত্যাদির ব্যবস্থা এই সংস্থার মাধ্যমে করা হয়েছে। বীরগতিপ্রাপ্ত করসেবকদের পরিবারকে সেবাকাজের এই সুযোগ করে দেওয়ার জন্য শ্রীরামজন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

শ্রীরামজন্মভূমি মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা—একটি বার্তা

শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী

মহা ধুমধামের সঙ্গে হয়ে গেল অযোধ্যায় শ্রীরামজন্মভূমি মন্দিরে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা। এ যেন শ্রীরামের দ্বিতীয় বনবাসের পরিসমাপ্তি। প্রথমবার পিতৃসত্য পালনে ১৪ বছর, এবার তাঁর সন্তানদের অবজ্ঞা ও অপদার্থতায় ৪৯৫ বছর— ১৫২৮ থেকে ২০২৩। অবশেষে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরলেন। পিতা দশরথের ইচ্ছা— রাম রাজা হবে, তা পূরণ হলো। তিনি রাজসিংহাসনে আরূঢ় হলেন ১৪০ কোটির আরাধ্য ভগবান শ্রীরাম। তার সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজীর স্বপ্নের রামরাজ্যের সুচনাও হয়ে গেল। দেশের প্রায় সব মত-পথ-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, সাধুসন্ত, রামভক্তের উপস্থিতিতে মন্দির আন্দোলনের অন্যতম সেনানি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর যজ্ঞাহুতির মধ্যে দিয়ে হলো মন্দিরের শুভ উদ্বোধন। পশ্চিমবঙ্গ-সহ সারা দেশের ঘরে ঘরে বেজে উঠল মঙ্গলশঙ্খ, জ্বলে উঠলো প্রদীপ, আলোকমালায় সজ্জিত হয়ে অকাল দীপাবলী পালিত হলো দেশের কোণে কোণে। এ যেন রাবণ বধের শেষে মা সীতাকে নিয়ে শ্রীরামের অযোধ্যায় ফেরার মুহূর্তে দেশবাসীর আনন্দ উচ্ছ্বাস।

১৯৮৩ সাল থেকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, ভারতীয় জনতা পার্টি, তার সঙ্গে লক্ষ লক্ষ রামভক্তের লড়াই- ত্যাগতিতিক্ষা-বলিদান আজ স্বীকৃতি পেল। ১৯৮৯ সালে বিজেপির তৎকালীন সভাপতি লালকৃষ্ণ আদবানীর সোমনাথ থেকে অযোধ্যা রামরথযাত্রা সারা দেশকে উদ্বেল করেছিল। তিনি শেষজীবনে চাক্ষুষ করে গেলেন নিজের রক্ত জল করা পরিশ্রমের সফলতা। ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর করসেবকদের রোষে বাবর নামে এক অভিশপ্ত দানবের হাতে শ্রীরামের জন্মস্থানে প্রাচীন মন্দির ভেঙে তৈরি করা বাবরি ধাঁচার উপরেই ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির মাথা তুলে দাঁড়ালো। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে এই দেশের সামনে একটি বিরাট প্রশ্ন চিহ্ন রেখে গেল এই মন্দির। প্রশ্ন এই যে, ১২৫ কোটির হিন্দুর যিনি আরাধ্য তাঁকে কেন ৫০০ বছর এমন লাঞ্ছনায় দিন কাটাতে হলো? কেন স্বাধীনতার পরে এতদিন তিনি নিজের ঘরে ফিরতে পারেননি?

এই মন্দির উদ্ধারে হিন্দু সমাজ কী করেনি! নেতাদের কাছে

আবেদন নিবেদন করেছে, শান্তি পূর্ণ সমাধানের চেষ্টায় মুসলমান পক্ষের সঙ্গে সমঝোতায় বসেছে, ব্রিটিশ শাসনের কাল থেকে ১৩৪ বছর আদালতের দোরে দোরে ঠোক্কর খেয়েছে, রায়ের জন্য অপেক্ষা করেছে, কিন্তু কেউই সেই আবেদনে কর্ণপাত করেনি। বহু পরীক্ষানিরীক্ষা শেষে তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্টের সুপ্রিম রায়ের পরেও মন্দির নির্মাণে কম বাধা আসেনি। মন্দিরের দিনক্ষণ ঘোষণা হতেই অধুনা মন্থরার দল কংগ্রেস-সমাজবাদী-তৃণমূল- সিপিএম-আর জে ডি-জে ডি ইউ, যারা সর্বদা ব্যঙ্গ করে বলতো 'মন্দির ওহী বানয়েঙ্গে লেকিন তারিখ নেহি বাতায়েঙ্গে' তারা একত্রিত হয়ে গেল রামের ঘরে ফেরা আটকাতে। হিন্দুর দেশে হিন্দুর দেবতার যদি এই অবস্থা হয় তবে তাঁর সন্তানদের এদেশে কী হাল?

শাস্ত্রে বলেছে, শুভ কাজে বিঘ্ন অনেক। তারও ছায়া দেখা গেল এবার। শয়তানি শুরু হলো রাম বিরোধী ইন্ডি জোটের। প্রথমে বলা হলো সব দলকে কেন ডাকা হয়নি? তার কদিন পর যখন রাজনৈতিক দলগুলির কাছে আমন্ত্রণ পৌঁছালো তখন আবার বলা হলো বাইশ জানুয়ারি শুভ দিন নয়; তিথি নক্ষত্র বিধান মেনে ঠিক হয়নি। এ কাজে তারা চার শঙ্করাচার্যের বক্তব্যকে ভুল ব্যাখ্যা করে প্রচার করা শুরু করলেন। বললেন— এ চরম অধার্মিক অনুষ্ঠান, তাই শঙ্করাচার্যরাও এই অনুষ্ঠান বয়কট করেছেন। পরের দিনই উত্তর এসে গেল শঙ্করাচার্যদের কাছ থেকে। তাঁরা বললেন— 'রামমন্দিরের প্রাণপ্রতিষ্ঠা যারা করছেন তারা নিশ্চয়ই বিধি মেনে করছেন। উদ্বোধনের পরে আমরা মন্দির পরিদর্শনে যাব।' এতেও তারা দমলেন না।

এবার নতুন ছক। বলা হলো দেশের প্রধানমন্ত্রী কেন মন্দির উদ্বোধন করবেন? এ তো ধর্মনিরপেক্ষ দেশের মূলেই কুঠারাঘাত। শঙ্করাচার্যেরা মোদীর কারণেই অনুষ্ঠানে আসছেন না ইত্যাদি। পরের দিন পুরীর শঙ্করাচার্য নিশ্চলানন্দ সরস্বতী উত্তর দিলেন, বললেন 'মোদীজী সনাতনী হিন্দু, তাই অযোধ্যায় যাচ্ছেন। মন্দির উদ্বোধন করছেন। সেকুলার হলে যেতেন না'। সারদা পীঠাধীশ্বর সদানন্দ সরস্বতী বললেন, 'দেশের প্রধান হিসেবে মোদীজীর অধিকার ও কর্তব্য রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার। মোদীজীকে সাধুবাদ। এবার মাঠে নামলেন বালঠাকরের বালখিল্য পুত্র উদ্ধবের সারথি সঞ্জয় রাউত। বললেন 'রামমন্দির সঠিক স্থানে নির্মিত হচ্ছে না। হচ্ছে জন্মস্থান থেকে তিন কিলোমিটার দূরে'। এবার প্রতিবাদ এলো সাধু-সন্তদের কাছ থেকে। তারা যুক্তি দিয়ে, তথ্য দিয়ে এই মিথ্যা প্রতারণাকেও অসার প্রতিপন্ন করলেন। বললেন 'রামমন্দির ঠিক সেখানেই হচ্ছে যেখানে রামলালা জন্মেছিলেন এবং যেখানে বিতর্কিত বাবরি ধাঁচা ছিল'।

এত কিছু করেও যখন কোনোমতেই রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা আটকানো যাচ্ছে না তখন খেলতে নামলেন কেরালার সিপিআইএম বিধায়ক কে কে বিজু। তিনি আবেদন জানালেন— ঘরে ঘরে ওইদিন টিভি চ্যালেন বন্ধ রাখতে। প্রয়োজনে কেরালার রাজ্য ইলেকট্রিক বোর্ড KSEB সারাদিন পাওয়ার সাপ্লাই বন্ধ রাখুক। এখানেও বিধিবাম। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিবাদের ঝড়। অতঃপর সোনিয়া মাইনোর অঙ্গুলিহেলনে ইন্ডি-জোটের দলগুলি চক্রব্যূহে ফেলার চেষ্টা করল রামকে। তারা

একযোগে বলল, এই অনুষ্ঠানে তারা কেউ যাবেন না, কারণ এ হলো আরএসএস-বিজেপির রাজনৈতিক কার্যক্রম।

প্রায় শতবর্ষে উপনীত জগদ্‌গুরু রামভদ্রাচার্য যখন যুক্তি দিয়ে, তথ্য দিয়ে দেখালেন যে নবনির্মিত রামমন্দির মোটেই অসম্পূর্ণ নয়, গর্ভগৃহ-সহ প্রথম তল সম্পূর্ণভাবে তৈরি হয়েছে, বরং ১৯৫১ সালে কংগ্রেস আমলে উদ্বোধন হাওয়া সোমনাথ মন্দির অসম্পূর্ণ ভাবে কেবল গর্ভগৃহ তৈরি হওয়ার পর রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রাসাদ দ্বারা উদ্ঘাটিত হয়েছিল, তবেই তারা রণে ভঙ্গ দিল। এ যেন ঠিক রাম- রাবণের যদ্ধ। রাবণ তার তূণ থেকে একটি একটি করে অস্ত্র নিক্ষেপ করছে, আর ভগবান রাম অবলীলায় তার ধনুষ-বাণের দ্বারা তা ছিন্নভিন্ন করছেন। শেষ পর্যন্ত বিরোধীরা পর্যুদস্ত হলেন। কোনোমতেই রামমন্দির উদ্বোধন আটকানো গেল না। শ্রীরাম ধ্বনিতে মুখরিত হলো সারা দেশ।

প্রকৃতপক্ষে হিন্দু বিরোধী জোটের রামমন্দির আটকানোর এতবড়ো ষড়যন্ত্র, এত অপপ্রচার ছিন্নভিন্ন করা বড়ো কঠিন ছিল। কিন্তু শ্রীরামের আশীর্বাদে কেন্দ্রে ও রাজ্যে রামভক্ত সরকার থাকার কারণে বিরোধীদের চক্রান্ত কোনোমতেই সফল হলো না। গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড়ো পরিচয় কী? লোক-আস্থার সম্মান, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতার বিশ্বাসের মর্যাদা দান। কেন্দ্রীয় সরকার সেটাই করেছে। ১৫২৮ সালে বাবর রামমন্দির ধ্বংস করার পর ৪৯৬ বছর ধরে প্রজন্মের পর প্রজন্ম হিন্দুরা লড়াই করেছে। প্রতি ছ' সাত বছর অন্তর চলেছে সংগ্রাম। ৭৬ বার যুদ্ধ হয়েছে। তিন লক্ষেরও বেশি রামভক্ত বলিদান দিয়েছেন। কত সাধুসন্ত, রাজা, সৈনিক, যুব-মহিলা, দেশের পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ— যার যা সাধ্য ছিল তা দিয়ে মন্দির উদ্ধারে চেষ্টা করেছে। আজ এতদিন পর এসেছে সফলতা। আমাদের মনে রাখা উচিত, রামমন্দির ফিরে পাওয়া হিন্দুত্বের বিজয়। তিন লক্ষেরও বেশি রামভক্তের বলিদান, লক্ষ লক্ষ করসেবকের আত্মাহুতি, লালকৃষ্ণ আডবানীজীর দেশব্যাপী জনজাগরণ রথয়াত্রা, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রধান অশোক সিংহলজীর রক্তস্নান, কলকাতার রাম-শরদ-সহ ৩৬২ জন রাম ভক্তের বলিদান— তার ফসল আজকের রামমন্দির। এ কোনো সর্বধর্ম সমন্বয়ের ফল নয়।

এই মন্দির প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এদেশের হিন্দু সমাজ এবং বিরোধী দলগুলিকে একটি

স্পষ্ট বার্তা দিয়ে গেলেন। সেই বার্তা হলো, এই ভারত হিন্দু ভারত। এই দেশের আইডেন্টিটি ভগবান রাম। তাই তার মন্দির পুনরুদ্ধারের কাজ দেশেরই কাজ। সে কাজ প্রধানমন্ত্রীর কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে। তিনি জওহরলাল নেহরু নন, যার কাছে মন্দির নামটাই ছিল অ্যালার্জির। তার প্রমাণ ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ যখন সোমনাথ মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন তখন জওহরলাল নেহরু চরম বিরক্তি প্রকাশ করে বলেছিলেন 'ভারতীয় সংস্কৃতির এই পুনরুত্থানে আমার কষ্ট হচ্ছে। আমার আরও কষ্ট হচ্ছে এই ভেবে যে আমাদের রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রীরা এই অনুষ্ঠানে অংশ নিচ্ছেন। আই অ্যাম ফিলিং ট্রাবল উইথ দিস রিভাইভ্যালিজম' (Selected স্পিচ, Vol-47, S Gopalan)। একইভাবে ১৯৪৯-এর ২৬ ডিসেম্বর, পুলিশ কনস্টেবল আব্দুল বরকত বিতর্কিত বাবরি ধাঁচার মধ্যে যেদিন রামলালাকে প্রকট হতে দেখেছিলেন (তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেটকে দেওয়া বরকতের

বয়ান) ক্ষিপ্ত জওহরলাল সেদিনই উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী গোবিন্দবল্লভ পন্থকে চিঠি লিখে শীঘ্র সেই রামলালার মূর্তি হঠাবার নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন। মোদীজী আজ প্রমাণ রেখেছেন তিনি জওহরলালের মতো রামকে ঘরছাড়া করতে আসেননি, রামকে তাঁর ঘরে প্রতিষ্ঠা করতে এসেছেন। তিনি মোটেই জওহরলালের উত্তরসূরি নয়।

আর যারা বলছেন মোদীজী কেন মন্দির উদ্বোধন করবেন, তাদের বলি, মোদী ছাড়া আর কার যোগ্যতা আছে রামমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করার? মোদীজী ছাড়া আর কার এমন বুকের পাটা আছে রামের হয়ে বুক ফুলিয়ে কথা বলার? ১৯৮৯ সালে

ফঃ ৪

আদবানীজীর রামরথে যুবনেতা হিসেবে যিনি ঘুরে বেড়িয়েছিলেন তিনিই তো আজকের প্রধানমন্ত্রী। বিরোধীদের মধ্যে মোদীজীর মতো কে আছেন যিনি গত ১১ জানুয়ারি থেকে উপবাসে রয়েছেন? অযোধ্যা থেকে পঞ্চবটি, কিসকিন্ধা, রামেশ্বর-সহ শ্রীরামচন্দ্রের পদধূলি রঞ্জিত ১১টি স্থানে ১১ দিন ধরে তপস্যা করেছেন? বিরোধীদের মধ্যে মোদীজীর মতো রামের প্রতি শ্রদ্ধা আর কার আছে? নেই। ৭৫ বছরে এদেশে তো কম প্রধানমন্ত্রী হননি। কেউ কি পেরেছেন রামের পায়ে এভাবে নিজেকে সমর্পণ করতে? যিনি রামকে তাঁর সর্বস্য সমর্পণ করেছেন তিনিইতো তাঁকে নিয়ে কিছু করার অধিকারী। তাই এই নিয়ে প্রশ্ন করবেন না। আর যারা বলেছিলেন বিজেপি এ নিয়ে রাজনীতি কছে তাদের বলি এদেশে একমাত্র বিজেপিরই অধিকার আছে রামকে নিয়ে কথা বলার। কারণ তারাই একমাত্র দল যারা তার জন্মলগ্ন থেকে রামমন্দির নিয়ে আন্দোলন করেছে। ১৯৮৪ থেকে আজও পর্যন্ত রামকে বুকে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। এদেশের প্রতিজনকে ডেকে ডেকে বলেছে রামমন্দির গড়ার প্রতিজ্ঞার কথা। আদবানীজী রামের জন্য সোমনাথ থেকে অযোধ্যা পর্যন্ত রথযাত্রা করেছেন, লালু প্রসাদের হাতে অ্যারেস্ট হয়েছেন, নির্যাতন সয়েছেন।

১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বরের পর একমাত্র বিজেপিই সেই দল যে রামের জন্য চার রাজ্যের সরকার বলিদান দিয়েছে। প্রকাশ্যে জয় শ্রীরাম বলার জন্য বিজেপির কর্মীরা লালু-মুলায়েম, কংগ্রেস-তৃণমূলের হাতে মার খেয়েছে, জেল খেটেছে। ১৯৮৪ থেকে

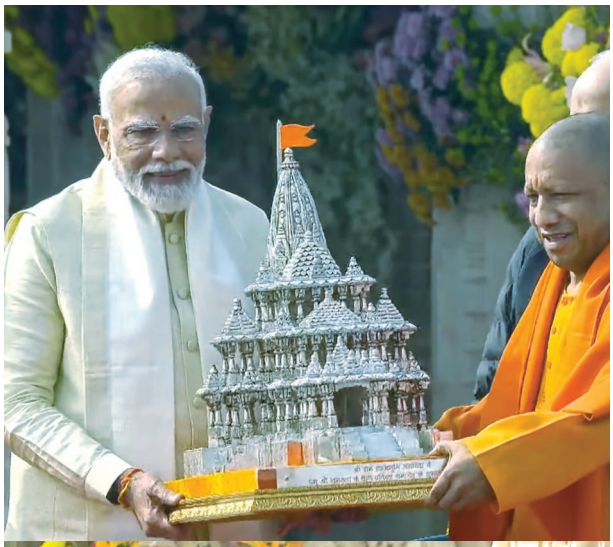

বিজেপিই একমাত্র দল যাদের প্রতিটি নির্বাচনী সংকল্পপত্রে রামমন্দির নির্মাণে অঙ্গীকার সবার উপরে ঠাঁই পেয়েছে। বিজেপি যেদিন দুই এমপির দল ছিল তখনও সে রামকে আঁকড়ে ছিল, আর আজ ৩০৩-এ ক্ষমতার শীর্ষে— আজও সে রামকে ভোলেনি। তবে মন্দির নির্মাণের এই ক্রেডিট বিজেপি ছাড়া আর কে নেবে, তবে কি সেই কংগ্রেস নেবে? যে কংগ্রেস সুপ্রিম কোর্টে এফিডেভিট দাখিল করে রামের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করেছিল, বলেছিল— রাম বলে কোনোকালে কেউ ছিল না, রাম হলো কাল্পনিক চরিত্র, তার বার্থ সার্টিফিকেট কোথায়, রামের জন্ম যে অযোধ্যায় তার প্রমাণ কী?

সেই কংগ্রেস নেবে যে রামের স্মৃতি বিজড়িত রামসেতু ভাঙার চক্রান্ত করেছিল? সেই কংগ্রেস নেবে যে মুসলমান ভোট পেতে বাবরি মসজিদ গড়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল? সেই কংগ্রেস নেবে যে মন্দির মামলার রায় যাতে দীর্ঘায়িত হয় তার জন্য সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানিয়েছিল? দুর্ভাগ্য আমাদের, এদেশের কোটি কোটি হিন্দু যখন নিশ্চিন্ত ছাদের নীচে দিনপাত করছে তখন তার পরমারাধ্য প্রভু শ্রীরাম এই কংগ্রেস ও তার সহযোগীদের চক্রান্তে দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে তাঁবুতে রোদ-বৃষ্টি, ঝড়-জলে অসহায় ভাবে দিন কাটিয়েছেন। এই কংগ্রেস আজ বিজেপির সমালোচনা করতে এসেছে! লজ্জা করে না? তবে শ্রীরাম আজ এই সেকুলারদের বড়ো বিপদে ফেলেছেন। রামমন্দিরের প্রাণপ্রতিষ্ঠায় না এসে তারা বুঝতে পেরেছেন যে চালে কত বড়ো ভুল হয়ে গেছে। তাই এখন লজ্জাশরম ছেড়ে ইউপির কংগ্রেস নেতারা এই কনকনে ঠাণ্ডায় জামা প্যান্ট খুলে গামছা জড়িয়ে সরযূ নদীতে দশবার ডুব লাগাচ্ছেন, রাহুল মাইনো তিলক লাগিয়ে ধুতি পরে শিবমন্দিরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী কালীঘাট মন্দিরে মাথা ঠুকছেন, মহারাষ্ট্রের উদ্ধব ঠাকরে গণেশ মন্দিরে সটান শুয়ে পড়ছেন। আর দিল্লির কেজরিওয়াল হনুমান চালিশা পাঠ করছেন— 'কিসসা ভোট কা'। নিজেদের বিজেপির চেয়েও সাচ্চা হিন্দু প্রমাণ করার তাগিদ। বিজেপি নয়, রাজনীতি আপনারাই করছেন--- তবে শ্রীরাম আপনাদের চালাকি ধরে ফেলেছেন।

একদা বাবরি মসজিদ নির্মাণের দাবি নিয়ে যিনি সুপ্রিম কোর্টে কেস লড়েছিলেন সেই ইকবাল আনসারী যদি আমন্ত্রিত হয়ে এই অনুষ্ঠানে আসতে পারেন, বিশ্বের ৫৫টা দেশের শতাধিক প্রতিনিধি এর সাক্ষী থাকতে পারেন, পৃথিবীর বহু দেশ রামমন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তাদের টিভিতে সরাসরি সম্প্রচার করতে পারে, সেদেশের পথে ঘাটে 'জায়েন্ট স্ক্রিন' লাগিয়ে 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনিতে মাতোয়ারা হতে পারে, ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে জয় শ্রীরাম ধ্বনি উঠতে পারে, তবে

রামের দেশের মানুষ হয়ে আপনারা কেন এখানে আসতে পারলেন না? আসলে এখানেই আপনাদের রাজনীতি। আপনারা প্রমাণ করলেন মুসলমান ভোটের জন্য রামকেও ছাড়তে পারেন, যেটা বিজেপি কোনোদিনও করতে পারেনি। যোগী আদিত্যনাথ ঠিকই বলেছেন, 'এদেশে যারা রামের মহত্ত্ব বোঝেনি তারা ভারতকে বুঝতে পারেনি, বা তারা সংখ্যালঘু তোষণের জন্য রামকে না বোঝার ভান করছেন। যারা রামকে আপন করেছে তারা উদ্ধার হয়ে গেছে, আর যারা রামকে অবজ্ঞা করেছে তারা ধ্বংস হয়েছে। যারা নিজের দুর্গতি চায় তারা রামের অবমাননা করুক, আর যারা নিজেদের উন্নতি চায় তারা রামকে শ্রদ্ধা জানাক'।

এটাই সত্য। ১৯৮৪ সালে যখন রামমন্দির আন্দোলন শুরু হয় তখন বিজেপি-২, আর কংগ্রেস ৪১৪। আজ শ্রীরামের দয়ায় বিজেপি ৩০৩, আর রামকে অবমাননা করে কংগ্রেস ৫২— চরম দুর্গতির শিকার। ২২ জানুয়ারি রামমন্দির উদ্বোধন বয়কট করে কংগ্রেস-তৃণমূল-সিপিএম-সমাজবাদী- জনতাদল আজ যে পাপ করল তার ক্ষমা নেই। আসলে গুবরেপোকা গোবরে থাকতেই ভালোবাসে, আর মৌমাছি ফুলে থাকতে। রামভক্তির মধু এত কাছে পেয়েও আপনারা মৌমাছি হতে পারলেন কই? ফুলের মধু গ্রহণ করার মতো সাধ আর সাধ্য কোনোটাই আপনাদের নেই। রামকে শ্রদ্ধা জানানোর এত বড়ো সুযোগ পেয়েও আপনারা হেলায় হারালেন। ■

রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার মহোৎসবে নক্ষত্র সমাবেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ৫০০ বছর ধরে সনাতন ধর্মের অবিরত সংগ্রামের পরিণতি অযোধ্যায় নবনির্মিত এই রামমন্দির। শ্রীরামমন্দিরে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার মহোৎসব পরিণত হয় এক নক্ষত্র সমাবেশে। স্বাধীনতার পর একটি অনুষ্ঠানকে ঘিরে এত বড়ো তারকা সমাবেশের সাক্ষী থাকেনি গোটা দেশ। উপস্থিত ছিলেন ৮ হাজার বিশিষ্ট অতিথি। তার মধ্যে বিশ্বের ৫৫টি দেশের প্রতিনিধি, ভারতের ১৫০টিরও বেশি পরম্পরার ধর্মাচার্য, বিভিন্ন আখড়া, মন্দির, মঠ ও মিশনের মহামণ্ডলেশ্বর, বরেণ্য সাধুসন্ত, পতঞ্জলি সংস্থার কর্ণধার বাবা রামদেব-সহ নবীন পট্টনায়েক, এইচ.ডি কুমারস্বামীর মতো বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন। শিল্প জগতের বিশিষ্টদের মধ্যে আমন্ত্রিত ছিলেন মুকেশ আম্বানি, তাঁর স্ত্রী নীতা আম্বানি, দুই পুত্র আকাশ ও অনন্ত-সহ পুত্রবধূরা, সপুত্র গৌতম আদানি, রতন টাটা, কুমারমঙ্গলম বিড়লা, অনিল আগরওয়াল, অজয় পিরামল, আনন্দ মাহিন্দ্রা, এন আর নারায়ণ মূর্তি, নবীন জিন্দাল প্রমুখ শিল্পপতি। সিনেমা জগতের বিশিষ্টদের মধ্যে ছিলেন— অমিতাভ বচ্চন, তাঁর পুত্র অভিষেক বচ্চন, রণবীর কাপুর, আলিয়া ভাট, রজনীকান্ত, অনুপম খের, চিরঞ্জীবী, অক্ষয় কুমার, মাধুরী দীক্ষিত, ধনুষ, রণদীপ হুড়া, অনুষ্কা শর্মা, কঙ্গনা রাণাওয়াত, মধুর ভাণ্ডারকর, অজয় দেবগণ, জ্যাকি শ্রফ, টাইগার শ্রফ, আয়ুষ্মান খুরানা, সানি দেওল, ভিকি কৌশল, ক্যাটরিনা কাইফ, প্রসূন যোশি, শ্রেয়া ঘোষাল, অনুপ জালোটা, সোনু নিগম প্রমুখ। ক্রীড়া জগতের বিশিষ্টদের মধ্যে আমন্ত্রিত ছিলেন— কপিল দেব, সুনীল গাভাসকর, শচীন তেন্ডুলকর, অনিল কুম্বলে, রাহুল দ্রাবিড়, মহেন্দ্র সিংহ ধোনি, বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, রবিচন্দ্রন অশ্বিন, মিতালি রাজ, রবীন্দ্র জাদেজা, নীরজ চোপড়া, বিশ্বনাথন আনন্দ, পিটি উষা, সাইনা নেহওয়াল, লিয়েন্ডার পেজ, পিভি সিন্ধু, বাইচুং ভুটিয়া, কল্যাণ চৌবে, বাচেন্দ্রী পাল, পুল্লেলা গোপীচাঁদ প্রমুখ। গায়ক শঙ্কর মহাদেবন, গায়িকা অনুরাধা পড়ওয়ালের কণ্ঠে শ্রীরামের ভজন অনুষ্ঠান স্থলে সৃষ্টি করে এক ভাবগম্ভীর পরিস্থিতি। ভারতীয় সামরিক বাহিনীর হেলিকপ্টার থেকে অনুষ্ঠান স্থলে করা হয় পুষ্পবৃষ্টি। মন্দিরের গর্ভগৃহে শাস্ত্রবিহিত প্রাণপ্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানের পর সমবেত অতিথি-অভ্যাগতদের উদ্দেশে রামমন্দিরের এই শুভ উদ্বোধন ও শ্রীরামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানের গুরুত্ব বিষয়ে বক্তব্য তুলে ধরার জন্য একটি সভা আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, শ্রীরামজন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের সভাপতি মোহন্ত নৃত্যগোপাল দাস, কোষাধ্যক্ষ স্বামী গোবিন্দদেব গিরি মহারাজ, উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল আনন্দীবেন প্যাটেল, মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহনরাও ভাগবত। সভার শুরুতে অযোধ্যার বিশিষ্ট কবি যতীন্দ্র মিশ্রের পরিচালনায় এবং নয়াদিল্লির সংগীত নাটক অ্যাকাডেমির সহায়তায় ভারতের ৫০টি ধ্রুপদী বাদ্যযন্ত্র সহযোগে পরিবেশিত হয়— 'মঙ্গলধ্বনি'। উপস্থিত ছিলেন নিহত করসেবকদের পরিবারের প্রতিনিধিরাও। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন অযোধ্যা রামমন্দিরের রৌপ্যনির্মিত রেপ্লিকা। সভাটি সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন ট্রাস্টের সম্পাদক চম্পত রাই। জাতীয় ঐতিহ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার এই মহতী অনুষ্ঠানে ভারতীয় মহাতারকাদের এহেন যোগদান অনবদ্য ও অভূতপূর্ব, অযোধ্যার বুকে যা সৃষ্টি করল এক নতুন ইতিহাস।

সন্তকথা

শ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারীর শিষ্য শ্রীতারানন্দ ব্রহ্মচারী প্রতিষ্ঠিত প্রেম মন্দির আশ্রম

কল্যাণ গৌতম

নর্মদা মায়ের সন্তান ব্রহ্মলীন শ্রীব্রহ্মানন্দজীর সুযোগ্য শিষ্য, শ্রীরামকৃষ্ণ সমকালীন যোগী-মহাপুরুষ শ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারীজীকে (১৮২৯/১৮৩০-১৯৩৭) 'সচল বৈদ্যনাথ' নামে ভারতের আধ্যাত্মিক জগৎ চেনেন। বালানন্দজীর সুযোগ্য শিষ্য ও পার্ষদ ছিলেন শ্রীতারানন্দ ব্রহ্মচারী (১৯০১-১৯৮১)।

আনুমানিক ১৮৩০ সালে বালানন্দজীর জন্ম উজ্জয়িনীর এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পূজারি-পরিবারে। আর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্ম ১৮৩৬ সালে। বালানন্দজী অতি অল্প বয়সে গৃহত্যাগী হন। বাল্যকালেই তিনি নর্মদা নদীর চারপাশে এক দীর্ঘপথ পদব্রজে পরিক্রমা করতে সংকল্পবদ্ধ হলেন। কখনও গহীন বন, কখনও জনপদ-লোকালয়, কখনও কৃষিভূমি, কখনও পাহাড়ি অঞ্চল, কখনও উপনদীর সঙ্গমস্থল পেরিয়ে এলেন। সঙ্গে কুলুকুলু ছন্দে আপন সৌন্দর্যে বয়ে চলেছে নদী। নর্মদার পথে পথে পরিক্রমা করতে করতে বালানন্দজী ভারতীয় সংস্কৃতি ও বহু পুণ্যশ্লোক সাধুসন্তের অতুল্য পরশ পেলেন। তীরে তীরে মন্দির- দেবালয়ের বিগ্রহ দর্শন হলো। লাভ করলেন পরমারাধ্য গুরুদেবকে, বরণ করে নিলেন চির-সন্ন্যাস। মানব জাতির মঙ্গলের জন্য তাঁর ঐশী সাধনা শুরু হলো তুরীয়ানন্দে।

বাল-ব্রহ্মচারীর সিদ্ধ যোগী হয়ে ওঠার অপরূপ আনন্দ-কথনের মধ্যে সনাতনী ভারতবর্ষের চিরকালীন অমৃতময় জীবনের বাণী ফুটে উঠেছে। নর্মদার বরপুত্র পরম শ্রদ্ধেয় গৌরীশঙ্কর মহারাজের কাছে বালানন্দজীর যোগ শিক্ষার কথায়, উত্তরাখণ্ড-সহ পূর্ব ভারত ও হিমালয়ের পথে পথে পদব্রজের পর্যটনে রয়েছে এক স্বর্গীয় রোমাঞ্চ। তপস্যা, সিদ্ধি, হরিদ্বারে শিষ্যের সঙ্গে সম্মিলন, কাশীধামে আগমন, বৈদ্যনাথ ধামে অবস্থানের পুণ্যকথার পরতে পরতে রয়েছে এক বিপুল আধ্যাত্মিক সম্পদ।

বালানন্দজীর দিব্য পারম্পর্যে এসেছিলেন শ্রীতারানন্দ, শ্রীসত্যানন্দ, শ্রীপরমানন্দ, শ্রীমোহনানন্দ, শ্রীকৃষ্ণানন্দ প্রমুখ বাঙ্গালি শাস্ত্রানুরাগী মহারাজেরা। শ্রীতারানন্দজী রিষড়ার প্রেম মন্দির আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর স্নেহধন্য, বর্তমান আশ্রমাধ্যক্ষ শ্রীমৎ দেবানন্দজী মহারাজ। নদীর ধারার মতোই আধ্যাত্মিক পথের এক চলমান ধারা, এক নাব্য পারম্পর্য। নর্মদা আর গঙ্গা

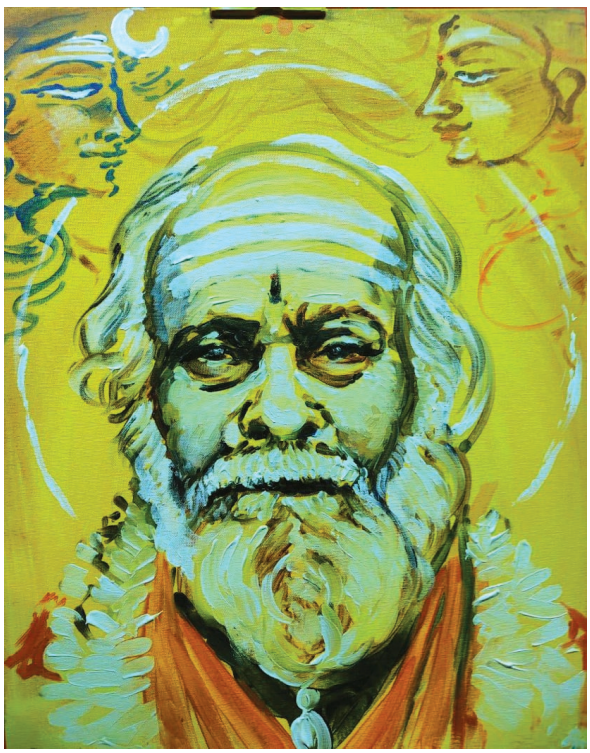

কীভাবে যেন মিলেমিশে গেল! নর্মদা-সন্ন্যাসীর প্রেম গঙ্গা-সন্ন্যাসীতে মিশলো। গঙ্গাতীরে গড়ে উঠলো প্রেম মন্দিরের আশ্রম প্রাঙ্গণ। প্রেম মন্দিরে প্রবেশ করা মাত্রই অনুভূতি হবে—

'তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর
তুমি তাই এসেছ নীচে।
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হতো যে মিছে।'

প্রেম মন্দিরে আসীন হলেন শ্রীশ্রীঅর্ধনারীশ্বর, শ্রীশ্রীশশিভূষণেশ্বর শিবলিঙ্গ, শ্রীশ্রীরাধামাধবের বিগ্রহ।

এ এক প্রেমের মন্দির। কেমন প্রেম? এ গোপন প্রেম নয়। কারণ 'গোপনে প্রেম রয় না ঘরে, আলোর মতো ছড়িয়ে পড়ে—।' এক চির-প্রকাশ্য পেম। 'নয়কো বনে, নয় বিজনে/নয়কো আমার আপন মনে—/ সবার যেথায় আপন তুমি, হে প্রিয়,/সেথায় আপন আমারও।।' এক গভীর প্রেম— 'আরো

প্রেমে আরো প্রেমে/মোর আমি ডুবে যাক নেমে।' যেখানে নিজে ডুবে যাই, ঈশ্বরকেও ডোবাই এমন এক প্রেম সমুদ্রে। সেই প্রেমিকপুরুষ ছিলেন তারানন্দজী, 'প্রেমের পাথার, ডুবলে হবি ভবপার।'

দেবালয়ের শরীরের নির্মিতি প্রেমে। নির্মাণ আর নির্মিতি বোধহয় আলাদা। যখন শিল্পী সৃজন করেন, তখন তাঁকে বলি 'নির্মিতি'। যখন কারিগর কোনো একঘেয়ে অনুকরণাত্মক কাজ করে যান, তাকে বলা হয় 'নির্মাণ'। অর্থাৎ শিল্পীর সৃষ্টিকে বলবো নির্মিতি, আর কারিগরের কাজকে বলবো নির্মাণ। শিল্পীর সৃষ্টিতে অনুসরণ থাকতে পারে, কিন্তু অনুকরণ নেই। কারিগরের কাজে অনুকরণ আছে। কারিগরের নির্মাণ একদম পরিমাণের মধ্যে ধরা; একটুও এদিক-ওদিক হবার জো নেই। নামকরা কোম্পানির রসগোল্লার কারিগর যে মিষ্টি বানান, রেসিপিতে এদিক থেকে ওদিক হবে না। কিন্তু কোনো কারিগর যদি সেই রসগোল্লার রস ছেঁকে তাকে ঘন দুধে জ্বাল দিয়ে মিষ্টি তৈরি করেন, তবে তা হবে নতুন শিল্প বা নব নির্মিতি। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, নির্মিতি রসের দিক থেকে মিত হলেও অপরিমিত। একটা নির্মাণের মতো আর একটা নির্মাণ চলে। শিল্পীর নির্মিতি কৌশলের কলে ফেললেও বৈষম্য থেকে যায়।

প্রেম মন্দির আশ্রম তেমনই এক আধ্যাত্মিক শিল্পীর রচনা অর্থাৎ নির্মিতি। শ্রীমৎ তারানন্দজী মহারাজের নির্মিতি। ১৩৪০ বঙ্গাব্দের মাঘমণ্ডলে গঙ্গার তীরে এক ছোট্ট সাধন কুটির তৈরি হয়েছিল। কালের বিবর্তনে তা প্রেমরূপ বিগ্রহ ধরে প্রাণস্পর্শী হয়েছে। কারিগর দিয়ে স্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্য স্বামীর অট্টালিকা নির্মাণ নয়। হিন্দু মন্দির ভেঙে মোঘল সম্রাটের প্রাসাদ নির্মাণ নয়। ছড়িয়ে পড়া বিশ্বপ্রেম মূরতি ধরে অধিষ্ঠান করছে এই দেবালয়ে।

এই প্রেম কীভাবে ছড়ায়?

রবীন্দ্রনাথ বলছেন—

'তব নাম লয়ে চন্দ্র তারা অসীম শূন্যে ধাইছে—
রবি হতে গ্রহে ঝরিছে প্রেম, গ্রহ হতে গ্রহে ছাইছে।'

তার মানে, প্রেম সামান্য কোনো বস্তু নয়। কাম তো নয়ই; দেহ সম্ভোগ নয়। প্রেমের আস্বাদ লাভ করতে হলে ঈশ্বরকে ভক্তজনের কাছে নেমে আসতে হয়। কেমন ভাবে?

'তাই তো, প্রভু, হেথায় এল নেমে,
তোমারি প্রেম ভক্তপ্রাণের প্রেমে,
মূর্তি তোমার যুগল-সম্মিলনে সেথায় পূর্ণ প্রকাশিছে।।'

বিশ্বনাথের সঙ্গে বিশ্বসাথে আমার যে যোগ, সেখানেই আমার প্রেম মূর্তি লাভ করে।

'নয়কো বনে, নয় বিজনে নয়কো আমার আপন মনে—
সবার যেথায় আপন তুমি, হে প্রিয়, সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারও।।'

অর্থাৎ এই প্রেম হলো বহুদর্শী, বহুর মধ্যে একত্ব অনুসন্ধান। ব্রহ্মলীন অনুভূতি; তারায় তারায় খচিত, তারানন্দ।

'সবার তুমি আনন্দধন, হে প্রিয়, আনন্দ সেই আমারও।।'

অর্থাৎ প্রেম হচ্ছে আনন্দ, প্রেমই হচ্ছে আরাধ্য।

'প্রেম' শিরোনামে তারানন্দজীর একটি কবিতা আছে।

'প্রেম! তুমি আরাধ্য আমার,
তোমারে করিয়া সার হব আমি ভব পার।'

প্রেমিকপুরুষ তারানন্দজীকে এই কারণেই বলি—

'প্রেম! তুমি অমৃত অক্ষয়
মরণ তোমার কাছে পায় পরাজয়।
সে শুধু করাল গ্রাসে, নশ্বর এ দেহ নাশে,
অন্তরে জাগিয়া রহে মূরতি চিন্ময়,
প্রেম! তুমি অমৃত অক্ষয়।।'

তাঁর রচনায় পাচ্ছি, প্রেম মহাশক্তিধর, প্রেম চিরানন্দময়, লোকময় অমূল্যরতন, অবিনাশী, অমর, স্পর্শমণি।

পদার্থবিদ্যায় একটি যুগান্তকারী সমীকরণ আছে E=mc2. ভর ও শক্তির নিত্যতা সূত্র। Theory of relativity. আলোর গতিবেগে যদি কোনো ভরসম্পন্ন পদার্থ ছুটে যায়, তবে তা মহাশক্তিতে পরিণত হয়। 'm' বা mass মানে কি রাধারূপী জীবাত্মার ভর? যিনি কৃষ্ণ বা পরমাত্মার পানে ছুটে চলেছেন পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হবেন বলে! আলোর গতিবেগ মানে কি অসীম শূন্যে ধাওয়া প্রেম? রবি হতে গ্রহে ঝরিছে প্রেম, গ্রহ হতে গ্রহে ছাইছে? ঈশ্বরের আনন্দের জন্য এবং মহাবিশ্বকে আনন্দ নিকেতন করার জন্যই কি প্রেমের সৃষ্টি?

'আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হতো যে মিছে।'

সত্যিই, এই আমি, এই জীব, এই অন্তর-রাধা না থাকলে কে চিনতেন তাঁকে? 'যদি জগাই মাধাই না থাকতো/তবে নিমাইকে কি চিনত লোকে?' এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয়েছে বটে। কিন্তু কে উপলব্ধি করবেন এই সমগ্র সৃষ্টি, এই সমগ্র অনুভূতি? ঈশ্বর পরমশক্তি, অথচ অনুভূতি শূন্য।, তিনি Energy, E. তাঁর নির্মাণ আছে, নিয়ন্ত্রণ আছে, গ্রন্থনা আছে, গভীরতা আছে। কিন্তু তাঁর প্রেমের অনুভূতি নেই, আবেগ নেই। সেই অনুভূতি পাবার জন্য তাঁকে আমাদের অর্থাৎ নরদেহের কাছে হাত পাততে হয়।

'আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হতো যে মিছে।
তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর
তুমি তাই এসেছ নীচে।'

ঈশ্বর চিরকালের দাতা। আমাদের জীব-শরীর চিরকালের গ্রহীতা। ঈশ্বরও গ্রহণ করতে চান। হাত পেতে চাইছেন তিনি আমাদের কাছে। রাজার রাজা চাইছেন। মনুষ্য নামক জীবের হৃদয়ে যে প্রেমের অনুভূতি আছে ভগবানকে তা পেতেই হবে। এটুকু দিতে পারবো না আমরা? পারবো না আমরা দিতে?

'আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা,
আমার হিয়ায় চলছে রসের খেলা,
মোর জীবনে বিচিত্ররূপ ধরে
তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে।।'

ভাষাসাধক হরিনাথ দে

শেখর সেনগুপ্ত

আমি যেখানে সপরিবারে বসবাস করি, সেই শহরতলিতে মাঝে মাঝে রাজনীতির বাদ্যি বেজে ওঠে ক্ষমতাসীন দলের নেতা বা নেত্রীর আগমনে। কিছু শ্রোতা ভিড় করেন এবং কৌতূহল মিটিয়ে সভা শেষ হবার আগেই যে যাঁর আশ্রয়ে ফিরে যান। একদিন কৌতূহলবশে আমিও এই রকম একটি রাজনৈতিক সভার একেবারে পিছনের সারিতে দাঁড়িয়ে ছিলাম প্রথম থেকে শেষ অবধি। ভাষণ দিচ্ছিলেন এই রাজ্যের একজন প্রশাসনের শীর্ষস্থানীয়া। তিনি তাঁর বক্তৃতায় বার বার বাঙ্গালি জাতির বহু বড়ো বড়ো পুরুষ ও মহিলার ঐতিহাসিক কৃতিত্বকে উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করছিলেন। তালিকাটি দীর্ঘ। কিন্তু তিনি একবারের জন্যও উচ্চারণ করেননি হরিনাথ দে-র নাম। হয়তো হরিনাথ দে সম্পর্কে তিনি অজ্ঞ অথবা তাঁকে কৃতী বঙ্গসন্তানদের দলে স্থান দেবার কথা ভাবেনও না। এটা আমার কাছে সত্যিকারের দুর্ভাগ্যজনক বলে মনে হয়েছিল। হরিনাথ দে-কে আজকাল সংখ্যাগরিষ্ঠ বঙ্গসন্তানরা ক্রমেই দূরান্তে ঠেলে দিচ্ছেন এবং এমন কোনও হালকা হালকা মন্তব্য করে বসেন, যা শ্রোতাকে স্তম্ভিত করে দেবার পথে যথেষ্ট। কেবল বাংলা ভাষা নয়, বাংলা ভাষার উৎপত্তি যে সাগর থেকে, সেই সংস্কৃত ভাষাতেও ছিল হরিনাধ দে-র গভীর ব্যুৎপত্তি।

একবার এক সভায় নবীন বয়সি হরিনাথ অনেকটা যেন আদুরে গলাতেই তাঁর বক্তৃতা গোড়া থেকে আগা অবধি সংস্কৃত ভাষাতেই দিয়েছিলেন এবং তা শুনে এক জমিদারপুত্র কিছু থোক টাকা উপহার দিতে এগিয়ে আসেন, যদিও হরিনাথ তা নিতে সরাসরি অস্বীকার করেন। অর্থাভাব কিছুটা ছিল, স্বভাবে উড়নচণ্ডী ছিলেন না। মধ্যবিত্তের গণ্ডীতেই নিজেকে বেঁধে রেখেছিলেন মাত্র চৌত্রিশটি বছর। চৌত্রিশ বছরে যেন গুনে গুনে ঠিক চৌত্রিশটি ভাষাতেই অনন্য ব্যুৎপত্তি অর্জন। প্রতিটি ভাষায় কতটা অধিকার তিনি অর্জন করেছেন, তার প্রমাণ দিতে বার বার লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষা দিয়েছেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তথা সভা-সমিতিতে। পরিশ্রমী মানুষ বললেই সবটা বলা হয় না; কাজ ছাড়া তিনি থাকতে পারেন না। তবে সব কাজই বই ও কাগজপত্র নিয়ে। অধ্যাপক রূপে তিনি সমকালে যেন একমেবাদ্বিতীয়ম্। কেবল ভাষা বা সাহিত্যের গণ্ডীতে আবদ্ধ নন, বিজ্ঞান ও গণিতেও অবাধ বিচরণ। অধ্যাপকরূপে তাঁর খ্যাতি ও চাহিদা তখন তুঙ্গে।

প্রেসিডেন্সি কলেজে যখন অধ্যাপনা করেন, তখন কলকাতার শিক্ষাকাশে তিনি এক সূর্য। আর্য ও অনার্য উভয় ভাষাতেই কথনে ও লিখনে তুলনাহীন। স্মরণশক্তি অসাধারণ। তাঁকে দিয়ে এমন সমস্ত পাঠ্যগ্রন্থও প্রকাশকরা লিখিয়েছেন, যাদের মলাটে হরিনাথ দে নামই নেই। লেখককে রয়েলটি না দেবার এ এক প্রায় চালুপ্রথা কলকাতার প্রকাশক মহলে। তবুও হরিনাথ যখন যে বিষয় নিয়েই কলম ধরেছেন, সেটাকেই মাথায় তুলে নিয়েছে সরকারি-বেসরকারি শিক্ষাবিভাগের বিবিধ স্তর। কিন্তু বিদ্যা ও শিক্ষা এমন দুটি বিষয়, যাদের সৌরভ ও গৌরব কখনও চাপা থাকে না। তাই একদিন দেখা গেল নিতান্ত বয়সে নবীন এক তরুণ প্রেসিডেন্সি কলেজে একাধিক সাহিত্য ও ভাষার ক্লাস নিয়ে চলেছেন। একটির পর একটি। টনক নড়ে ওঠে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরও। সেখান থেকেও অফার আসে গুচ্ছের ক্লাস নেবার জন্য। আজকের ন্যাশনাল লাইব্রেরির পরিচিতি তখন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি নামে। সেই গ্রন্থাগারের প্রথম চারটি চেয়ারের অধিকার লাভের জন্য সাহেবদের মধ্যেও চলছিল টানাটানি। একদিন দেখা গেল চার কর্তাই এসে হাত জোড় করে দাঁড়িয়েছেন বাঙ্গালি হরিনাথ দে'র সামনে— 'ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে আমরা এখন থেকে একটিই উঁচু চেয়ার রাখব এবং সেটাতে গিয়ে বসবেন মাত্র একজনই,— তিনি মিস্টার হরিনাথ দে।'

হরিনাথ রাজি হয়ে গেলেন। পরাধীন দেশের একজন, যাঁর কোনও নাগরিকত্ব নেই, মহাগুণীরাও যেখানে শোষকদের পাদদেশেই স্থান পেয়ে থাকেন, সেখানে হরিনাথ দে প্রকৃতই এক মস্ত ব্যতিক্রম। অনেক পদপ্রত্যাশীকে হতাশ করে দিয়ে হরিনাথ দে-ই হয়ে গেলেন দেশের সর্বোচ্চ গ্রন্থাগারিক। বয়সে নবীন, প্রশাসনে দক্ষ, সর্বক্ষণ বিদ্যার্জনে ব্যাকুল। এক কথায় রাজি হননি, শর্ত ছিল যথাযথ স্বাধীনতালাভ বিদ্যাচর্চায়। সর্বোচ্চ গ্রন্থাগারিক হয়েই লিখে ফেললেন ভারতে প্রথম ইংরেজি-পার্সিয়ান অভিধান। মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'কে ইংরেজিতে অনুবাদ করলেন কাব্যিক সৌকর্যকে যথাযথ রেখে। বিশ্বসাহিত্যের আরও অনেক গ্রন্থের অসাধারণ ভাষান্তর বাস্তবায়িত হলো। তাঁর মতো ভাষাবিদ ভারতে আর কেউ

জন্মেছেন কিনা সন্দেহ আছে। কেবল ভারত কেন, সারা বিশ্বেই তিনি অবিস্মরণীয়। হিসেব কষে দেখা গিয়েছে, বিশ্বের প্রথম চৌত্রিশটি ভাষাতেই তাঁর অর্জন অনন্য। খ্রিস্টভুবনের প্রধান মহামান্য পোপ হরিনাথকে সাদরে নিয়ে যান রোমে এবং সেখানে তিনি হরিনাথকে দিয়েই বাইবেলের অনুবাদ করান বিশ্বের ঊনিশটি ভাষায়। ইতালি সমেত তামাম দুনিয়া তখন বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় নত এই বঙ্গতনয়ের পাদমূলে।

জন্ম ১২ আগস্ট, ১৮৭৭। জন্মস্থান আড়িয়াদহ গ্রাম, যার অদূরে দক্ষিণেশ্বর। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রত্ন। তবে জনক ভূতনাথ দে-র সঙ্গ বেশিদিন পাননি। কারণ, ভূতনাথ দে-র কর্মস্থল ছিল বর্তমান ছত্রিশগড়ের ভিলাই এলাকায়। ছত্রিশগড়েরই রায়পুর হাইস্কুলের মেধাবী ছাত্র ছিল হরিনাথ। সেখানেই বাংলা, ইংরেজি, ওড়িয়া ও হিন্দি ভাষায় তিনি অনর্গল কথা বলতে ও লিখতে শেখেন। পরে চলে আসেন কলকাতায়। মাত্র আড়াই বছরের মধ্যে চৌত্রিশটি ভাষায় তাঁর অধিকার অর্জন প্রকৃতই এক মায়াবী ব্যাপার। এই নিয়ে তাঁকে বাহাবা জানালে হরিনাথ প্রায়শ যা বলতেন, তা হলো এরকম— 'দেখুন, আমি হিন্দু এবং হিন্দুদের আদত ভাষা হলো সংস্কৃত। আমি প্রথম থেকেই সংস্কৃতের ওজস্বিতাকে কদাপি আড়াল করিনি। বরং এই আর্যভাষাকে অবলম্বন করতে পেরেছিলাম বলেই দুনিয়ার বেশিরভাগ ভাষাকেই সংস্কৃতেরই অবিকল ছায়া বলে মনে হয়েছে এবং আমি সর্বভাষার সিঁড়ি বা ধাপগুলিতে পা রেখেছি। কদাচ ভয় ভয় ভাব আমার ভাবনায় আসেনি, আবার হই হই করেও উঠিনি পাঠ্যভুবনের একটা কোনও স্তর থেকে নিস্তার পেতে।'

হরিনাথ কেবল ভাষাবিশেষজ্ঞ হননি, তাঁর মতো মেধাবী ছাত্র বিরলদের মধ্যে বিরলতম। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লাতিন ও ইংরেজি ভাষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন যুগপৎ অনার্স এবং এম.এ পরীক্ষায়। বৃত্তি পেয়ে চলে গেলেন বিলেতের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে তিনি গ্রিক ভাষায় এম.এ. হন প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে। লন্ডন ছেড়ে পাড়ি জমান ফ্রান্সের প্যারিসে। সেখানে বিশিষ্টজনদের এক জমায়েতে আমন্ত্রিত হয়ে তিনি ভাষণ দিয়েছিলেন সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজি, জর্মান ও ফরাসিতে। শ্রোতারা একেবারে বাক্যরুদ্ধ। প্রতিটি ফরাসি পত্রপত্রিকায় হরিনাথ দে'র ছবি ও গুণকীর্তন ছাপা হয়েছিল তার পরদিন। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রিক ভাষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন তিনি। পরাধীন ভারতের ইংরেজ সরকার তাঁকে ঈর্ষা করত। তাঁদের আশঙ্কা ছিল, হরিনাথ যেদিন তাঁর পাণ্ডিত্যের জোরে বিদেশে ভারতীয় সভ্যতা, কৃষ্টি, শিক্ষা ও ধর্মবোধ নিয়ে হরেক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ দিয়ে বেড়াবেন, ইংরেজ, ফরাসি প্রমুখ মদগর্বী সাম্রাজ্যবাদীদের লজ্জায় মাথাকাটা যাবার উপক্রম হবে। কেবল ইউরোপের বিভিন্ন দেশ নয়, শিক্ষাদানের অনুরোধ পেয়ে তিনি চলে গিয়েছিলেন মিশরের কায়রো, সিরিয়ার দামাস্কাস, ইতালির রোম, পোল্যান্ডের ওয়ারশ— কত দেশের কত শত সভা ও শিক্ষালয়ে।

ভারতে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ঘটাতে তিনি যে ডাক দেন, তাতে এদেশে ভালোই কম্পন ওঠে। ব্রিটিশ সরকার চাইত, বড়ো চাকরির টোপ দিয়ে হরিনাথ দে-কে এই দেশেই গণ্ডীবদ্ধ করে রাখতে। তিনিই প্রথম ভারতীয়, ইংরেজ সরকার যাঁকে এই দেশের Education Department-এর Chief executive করে। হরিনাথ দে অবশ্য ওই পদে তিন মাসের বেশি থাকতে চাননি। ১৯০৬ সালে হরিনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পালি ভাষায় এম.এ হলেন প্রথম শ্রেণীতে প্রথম। হরিনাথ প্রতি মাসে যত টাকা উপার্জন করতেন, তার অর্ধেকের বেশি ব্যয় করতেন বই কিনে। রকমারি বিষয়ের বই ছিল তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরিতে। একই বিষয়ের ওপর লিখিত গ্রন্থ কেন ও কীভাবে পরস্পরের চরিত্রে আমূল বদল ঘটাতে পারে, তাঁর সাহিত্য বিশ্লেষণে সেটাই হয়ে উঠেছে প্রধান বিচার্য বিষয়। রচনাশৈলীতে তাঁর কোনও নির্দিষ্ট ফরম্যাট নেই, যদিও ভাবগাম্ভীর্যে বহুক্ষেত্রে তারা হতে পারত অবিচ্ছেদ্য, অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। যখনই কলকাতার কলেজ স্ট্রিট থেকে বাড়ি ফিরতেন, তাঁর দুই কাঁধেই ঝুলত বইঠাসা ব্যাগ। লোকজনের ভিড়, যানবাহনের জটিলতা কিছুই তাঁর পুস্তকসর্বস্ব প্রাণস্পন্দনে ভিন্ন কোনও বার্তা বহন করে আনতে পারত না। ভাষা শিক্ষকরূপে তাঁর খ্যাতি ব্যাপ্তি পায় সারা দুনিয়ায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের তিনিই প্রথম পুরোহিত। কেবল পাঠ ও ভাষ্যরচনা নয়, সম্পাদনা ও অনুবাদেও তাঁর অবদান আজও অনন্য।

১৯০২ ইবনবতুতার লেখা বিশ্বখ্যাত ভ্রমণগ্রন্থ 'কিতাব-উর- রেহলা'-কে ইংরেজিতে অনুবাদ করে সাড়া ফেলে দেন। ফরাসি ভাষায় তিনি লিখেছিলেন ঢাকা শহরের আদ্যন্ত ইতিহাস। আবার বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাতখানা উপন্যাস তিনি বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন এবং সেই সাতখানা বই-ই ইংরেজ পাঠকদের শ্রদ্ধাবান করে তোলে বঙ্কিমের প্রতি। যদি দীর্ঘায়ু হতে পারতেন, চৌত্রিশটি ভাষায় সাহিত্য প্রতিভারূপে দক্ষ হরিনাথ দে হয়তো প্রথম বাংলা ভাষার সৃষ্টিশীল লেখক রূপেও নোবেল পুরস্কার পেতে পারতেন বলে মনে হয়। লন্ডন, নিউইয়র্ক, টোকিও, রোম, মস্কো, কায়রো— বিশ্বের যখন যেখানে পা রেখেছেন, পেয়েছেন অঢেল শ্রদ্ধা ও প্রীতি। অথচ বয়সে নিতান্ত তরুণ এবং দিনের পর দিন, রাতের পর রাত লেখালেখিতে ডুবে থাকায় শরীর হয়ে যাচ্ছে শক্তিহীন, শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। ওই শরীর নিয়েই তিনি ভাষা, ব্যাকরণ, ইতিহাস, হিন্দুধর্মতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে লিখে ফেলেছিলেন অষ্টাশিখানা গ্রন্থ, যা আজ কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরির অমূল্য সম্পদ হয়ে আছে। অষ্টাশিখানা গ্রন্থের যে কোনও একটিকে তুলে নিন, আপনার প্রাণস্পন্দন এক বিশাল ভুবনের সন্ধান পাবে।

পারিবারিক জীবন, প্রকৃতির হাতছানি, তাৎপর্যমণ্ডিত হরেক বিষয়ের টানাটানি, অভিব্যক্তিতে প্রায়শ নিশ্চলতা, অপরিমিত শারীরিক দুর্বলতা, এ এমন এক ব্যক্তিত্ব, যাকে ভাবনার ভুবন হাতছাড়া করতে চায় না— অনুভূতির তাবৎ চাতুর্য হুংকার, আক্ষেপ নিমিষে চম্পট দেয়। দ্বিতীয় কোনও হরিনাথ দে কি এই বঙ্গে আর আবির্ভূত হবেন? মাত্র চৌত্রিশ বছর বয়সে যখন চলে গেলেন ভিন্নলোকে, ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন— 'হরিনাথ দে-র সমকক্ষ প্রতিভাবান তরুণের স্মৃতি আমার কাছে যেন মহেঞ্জদড়ো আবিষ্কার সম হীরকখচিত প্রাপ্তি। এই ১৯১১ সনের ৩০ আগস্ট, আমরা যাঁকে হারালাম, তাঁর মূল্যায়ন করবার সক্ষমতা অন্তত আমার নেই।'

সত্যি, কী বিস্ময়কর অবদান সেই বঙ্গসন্তানের। হরিনাথ দে-র বিকল্প আমরা আজও পাইনি, ভবিষ্যতেও পাবো কিনা, সন্দেহ। □

দেশের মানুষের জীবনে মৌলিক পরিবর্তন এনেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

সুদীপ্ত গুহ

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আমাদের দেশকে নতুন কী দিলেন, সেটা আমাদের একবার সহজ ভাষায় বোঝা এবং দেশবাসীকে বোঝানো দরকার। অটলজীর ছ'বছর রাজত্বকালে দেশের মানুষের জীবন ও জীবিকায় বেশ কিছু মৌলিক পরিবর্তন এসেছে, যা সাধারণ মানুষকে বোঝানো যায়নি। তার ফলেই ২০০৪-এ অটলজী হেরে যান। কিন্তু তাঁর হারের চেয়ে বড়ো হার হয় দেশের। পরের দশ বছর দেশ এমন এক সরকার পায় যাকে ইতিহাস মনে রাখবে সিদ্ধান্তহীনতার জন্য। সারা পৃথিবীর থেকে পিছিয়ে যায় ভারত। ১৯৯৮ পর্যন্ত ভারতীয়রা বাড়ি বানাতো অবসর গ্রহণের পর, ২০০৪-এ চাকরিতে যোগ দিয়েই ব্যাংকের লোন নিয়ে সেই বাড়ি বানাতো। ১৯৯৮-এ ভারতীয় পরিযায়ী শ্রমিক রাত ১১টা পর্যন্ত জেগে টেলিফোন বুথের বাইরে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত বাড়িতে ফোন করবে বলে। ২০০৪-এ তাঁদের হাতে অটলজী তুলে দিয়েছেন মোবাইল ফোন। তৈরি করেন স্বর্ণ চতুর্ভুজ এবং জুড়ে দেন দেশকে। তারপরেও অটলজী প্রশ্ন করেন, 'আমরা এত কাজ করে হেরে গেলাম, অথচ দেশের একটা রাজ্যে একটা সরকার কিছু না করে, সব ধ্বংস করে কীভাবে ২৭ বছর টিকে আছে, এটা একটা বড়ো বিস্ময়।'

মোদী কী দিলেন? মোদী ভারতের কাজের ক্ষেত্রেই পালটে দিয়েছেন। অর্থনীতিতে মূলত চারটি ক্ষেত্র আছে। ১. প্রাইমারি অর্থাৎ কৃষি (সঙ্গে পশুপালন, মৎস্যচাষ ইত্যাদি)। ২. সেকেন্ডারি অর্থাৎ উৎপাদন তথা ম্যানুফ্যাকচারিং, ৩. টার্শিয়ারি তথা পরিষেবা, ৪. কোয়ার্টারনারি অর্থাৎ মেধাস্বত্ত। কিন্তু ২০১৪-তে প্রধানমন্ত্রী হয়ে মোদী দেখলেন, ভারতে পরিষেবা বাদে অন্য কোনো সেক্টরই সঠিকভাবে কাজ করছিল না। চাষিরা সবুজ বিপ্লবের পর উৎপাদন বাড়িয়েছে বহুগুণ, কিন্তু বাজার থেকে গেছে অসংগঠিত, যা কৃত্রিমভাবে অসৎ আড়তদার ও নেতাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তার উপর মূলধনের অভাব, ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে চাষিদের দূরে রাখা এবং বিমা ব্যবস্থার অনুপস্থিতি। অধিকাংশ মানুষের ছিল না পাকা বাড়ি, আধুনিক শৌচাগার, সেচের জল, বিদ্যুৎ, রান্নার গ্যাস। ফলে সব চেয়ে বেশি উৎপাদন করেও, পৃথিবীর সবচেয়ে দরিদ্রতম ছিল আমাদের চাষিভাইয়েরা। ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রে, ১৯৯১ পর্যন্ত আমরা নির্ভর করেছি সোভিয়েত রাশিয়া থেকে আমদানির উপর এবং তার পরেও নির্ভর করেছি চীনের উপর অধিকাংশ পণ্যের জন্য। ১৯৯১-এর পর, পরিষেবা ক্ষেত্র আমাদের বাঁচিয়ে দিলেও কাজ করেছিল মূলত লো এন্ড প্রযুক্তিতে। গবেষণা নির্ভর কাজে ছিলাম পিছিয়ে এবং পরনির্ভর। ভোজ্য তেল ৬০ শতাংশ আসতো বিদেশ থেকে, শক্তিক্ষেত্রে মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার উপর নির্ভরশীল ছিলাম।

এই অবস্থায় মোদী ক্ষমতায় এসে একের পর এক সংস্কার শুরু করেন দেশের উন্নতিযজ্ঞে দরিদ্রতম মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করতে। পৃথিবীর ছোটো-বড়ো সব

দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন বাজার ধরা এবং তাঁদের বাজার থেকে সস্তায় মূলধন পাওয়ার জন্য। ব্যাংকিং এবং কর ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনেন। সংস্কার আনার চেষ্টা করেন কৃষি বিপণনে, শ্রমিক আইনে। পরিকাঠামো ক্ষেত্রে আনেন আমূল পরিবর্তন। দেশের রেল, সড়ক, বিমানবন্দর, শিল্প করিডোর, মালগাড়ি (ফ্রেট) করিডোর, জলপথ, বন্দরকে এক সূত্রে বেঁধে ফেলেন। উদ্দেশ্য একটাই। সেই সব বিদেশি পুঁজিপতিকে ভারতে আনা যাদের হাতে প্রযুক্তি ও মূলধন দুটোই আছে। বিকল্প শক্তির সন্ধানে খোঁজা হচ্ছে নতুন প্রযুক্তি ও বাজার। ভারতে চালু হয়েছে নিজস্ব পেমেন্ট সিস্টেম, যা ব্যবহারে সহজ ও সুলভ।

কূটনৈতিক ক্ষেত্রে ভারত নতুন পথ নিয়েছে। পৃথিবীর ছোটো বড়ো সব দেশের সঙ্গে আলাদা ভাবে সম্পর্ক রেখেছে। রাশিয়া থেকে ল্যাটিন আমেরিকা। জি-৭-এ ভারতকে আমন্ত্রণ করা হচ্ছে প্রতিবার, কারণ ভারতকে বাদ দিলে পৃথিবীর সাতটি শক্তিশালী দেশের টিকে থাকা মুশকিল। জি-২০-তে ভারতের সভাপতিত্ব, আফ্রিকার বহুদেশকে এই প্লাটফর্মে আসার সুযোগ দিল। I২U২, কোয়াড, ব্রিক্স, সাংহাই কো-অপারেশন-সহ সব জোটেই ভারত আছে। আর তার ফল আসাও শুরু হয়েছে। গত দুই আর্থিক বর্ষে ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির হার পৃথিবীর সর্বোচ্চ, মুদ্রাস্ফীতি বহু পশ্চিমি দেশের থেকে কম হয়েছে ৭৫ বছরে প্রথমবার। দেশের সব ব্যাংকের লাভ একলক্ষ কোটি ছাড়িয়েছে, রেকর্ড বিদেশি মুদ্রা ভাণ্ডার, রপ্তানিতে রেকর্ড।

কিন্তু এই কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক জয় থেকে দেশ কী পেল? দেশের মোট বড়ো সড়ক ৯৮ হাজার কিলোমিটার থেকে বেড়ে ১৪৫ হাজার হয়েছে মাত্র ৯ বছরে। ২০১৩-১৪-তে যেখানে প্রতিদিন ১৩ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি হতো, সেখানে আজ ২৮ কিলোমিটার হচ্ছে। গত দশ বছরে গ্রামীণ সড়ক তৈরি হয়েছে ৩.৫ লক্ষ কিলোমিটার, যা চাষি, গ্রামের ছোটো ব্যবসায়ীদের আর্থিক স্বাধীনতা বাড়িয়েছে বহুগুণ। ৯৯ শতাংশ গ্রাম প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার সুফল পেয়েছে। রেলের বৈদ্যুতীকরণ প্রায় ৪০ হাজার কিলোমিটার, মেট্রো রেল তৈরি হয়েছে ৮৫০ কিলোমিটার, ১৪৮টি বিমানবন্দর। ২০১৪ পর্যন্ত আমাদের দেশের পঞ্চায়েত এলাকায় মোট ফাইবার কেবল নেটওয়ার্ক ছিল ৩৫০ কিলোমিটার, যা আজ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬ লক্ষ কিলোমিটার। দূরদূরান্তের গ্রামের ছেলে-মেয়েরা আজ নিজের বাড়িতে বসে সিভিল সার্ভিস, আইআইটি থেকে ব্যাংকিং পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে মাসে ২০০ টাকার ইন্টারনেট ডাটা কিনে। গত ন'বছরে ৩.২১ কোটি মানুষকে পাকা বাড়ি করেছে ওরা হয়েছে, যার সুফল পেয়েছে ১২ কোটি মানুষ। আরও ৪ কোটি মানুষের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে নিজের বাড়ি। ২০১৪ পর্যন্ত দেশের ১৭ শতাংশ দেশের মানুষের ঘরে নলবাহিত জল ছিল, যা আজ ৭০ শতাংশ মানুষের ঘরে পৌঁছেছে। এর ফলে আগামীদিনে আর্সেনিক, ফ্লোরিন এবং বিভিন্ন জলবাহিত রোগ থেকে দেশের বড়ো অংশের মানুষ চিরতরে মুক্তি পাবে। ১০০ শতাংশ গ্রাম স্বচ্ছ ভারত মিশনের সুবিধা পেয়েছে। উন্নয়ন যে পরিবেশকে সঙ্গে নিয়ে করা যায়, তা প্রমাণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দেশের মায়েদের ধোঁয়া থেকে মুক্তি দিতে ১০০ শতাংশ গ্রামে পাঠানো হয়েছে উজ্জ্বলা গ্যাস। একসময় দেশ কোটি কোটি টাকা গ্যাসের ভরতুকি দিত, যার সুফল পেত ছোটো থেকে বড়ো হোটেল এবং বড়ো শহরের পয়সাওয়ালা মানুষ, যাদের ভরতুকির কোনো প্রয়োজন নেই।

কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো শিল্প। আগেই বলেছি, ১৯৯১ পর্যন্ত আমরা নিজেরা উৎপাদন না করে সোভিয়েত দেশ থেকে অধিকাংশ মেশিন আমদানি করতাম। কিছু শিল্পপতি অবশ্য লাইসেন্স ম্যানেজ করে তাঁদের কাজ শুরু করেন। কিন্তু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বয়লার, স্টিল প্লান্টের মেশিন, খনির মেশিন থেকে কম্পিউটার সব আমরা সেই সময়ে বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করতাম। আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের কাজ ছিল মূলত অপারেশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স। ১৯৯১-তে কংগ্রেসের প্রথম অগান্ধী পরিবারের প্রধানমন্ত্রী পিভি নরসিমা রাওয়ের আমলে নেহরুভিয়ান মিশ্রঅর্থনীতি বিদায় দিলে, পরিষেবা শিল্প শুরু হয়। কিন্তু উৎপাদন ও কৃষি ক্ষেত্রে আমরা সোভিয়েতের বদলে চীনের উপর নির্ভর করতে থাকি। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে অবশ্য আজও অনেকটা সোভিয়েতের উপর নির্ভর করি। কিন্তু ২০১৪-তে পরিবর্তন আনলেন মোদী। মেক ইন ইন্ডিয়া-র প্রকল্প বাস্তবায়িত করতে শুরু করেন বিভিন্ন সংস্কার। আর এর ফলে দেশে একের পর এক বিনিয়োগ শুরু হয় ইলেকট্রিক, ওষুধ, বায়োমেডিসিন ইঞ্জিনিয়ারিং, প্রতিরক্ষা, মহাকাশ, খনি, টেলিকম ইত্যাদি ক্ষেত্রে। এর আগে ভোটের ইস্যু হতো, 'কেন শিল্প হয়নি?' অথচ এবার প্রথম প্রশ্ন তোলা হচ্ছে যে 'শিল্পের কী প্রয়োজন?' প্রশ্ন তুলেছেন রাহুল গান্ধীর পরামর্শদাতা তথা রিজার্ভ ব্যাংকের প্রাক্তন প্রধান ড. রঘুরাম রাজন। সারা দেশে সেমিনার করে এবং একটি বই লিখে তিনি সারা দেশে প্রচার চালাচ্ছেন যে মোদী ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প তৈরি করে ঠিক করছেন না। আমাদের চীন ও ভিয়েতনাম থেকে কম দামে পণ্য কেনার উপর জোর দেওয়া উচিত বলে তিনি প্রচার চালাচ্ছেন। সরকারের শিল্পোন্নয়নের প্রধান সাক্ষী ড. রাজনের ওই বই এবং সেমিনারে রাখা বক্তব্য।

এই প্রসঙ্গে ড. নির্মলা সীতারামনের কথা না বললেই নয়। দেশের প্রথম মহিলা অর্থমন্ত্রীকে বহু টিপ্পনী শুনতে হয়েছে প্রথম দু' বছর। অর্থমন্ত্রকের দায়িত্ব পাওয়ার কিছু দিনের মধ্যেই সবচেয়ে বড়ো অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় তাঁকে। আসে কোভিড। বিশ্বের তাবড় অর্থনীতিবিদ তথা MIT, হার্ভার্ড, LSE, IIM, JNU, ISI এবং অবশ্যই যাদবপুরের অধ্যাপকরা তাঁর উপর চাপ দিতে থাকেন টাকা ছাপিয়ে বিলি করতে। কিন্তু এই ফাঁদে তিনি পা দেননি। লকডাউন বন্ধ করতেও অনেকে উপদেশ দেন অনেকে। নির্মলা সীতারামন এই সব না কানে নিয়ে, বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ করেন, যাতে কর্মসংস্থান হয়। যেমন পরিকাঠামো, কৃষি, গোপালন মৎস্যচাষ, বিভিন্ন MSME, লজিসটিক্স ইত্যাদি। সঙ্গে গৃহঋণ-সহ কিছু ক্ষেত্রে মোরাটোরিয়াম দেন ৫ মাস। একই সঙ্গে চলে রিজার্ভ ব্যাংকের মানিটরি পলিসি কমিটির পর্যায়ক্রমিক পর্যবেক্ষণ। আজ ২০২৪-এ পৃথিবীর আধা দেশ যখন মন্দা ও মুদ্রাস্ফীতির চাপে ভুগছে, তখন ভারত পৃথিবীর দ্রুততম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ।

কিন্তু অন্যায় আন্দোলনে পিছিয়ে আসতে

হয় কৃষি বিল থেকে। আমাদের দেশে যাদবপুর বা জেএনইউ থেকে পাশ করা ছাত্র-ছাত্রীরা পাশ করেই বিদেশে যেতে পারেন, কিন্তু চাষিদের স্বাধীনতা নেই তাঁদের পণ্য বিদেশে বা নিজের ইচ্ছে মতো বেচেতে। হিমঘর বানালেও বহু বিধিনিষেধ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা সরকার নিয়ন্ত্রিত কৃষি বিপণন দপ্তরের অসৎ বাবু এবং নেতাদের উপর নির্ভর করেন। দাম না পেয়ে রক্ত জল করা ফসল নষ্ট করেন কিংবা আত্মহত্যা। এর কারণ নেহরু-গান্ধী পরিবারের বানানো তিনটি কালাআইন। ১৯৯১-তে শিল্পে রাওজী সংস্কার আনতে পারলেও কৃষিতে পারেননি। অটলজীও পারেননি, যেহেতু তাঁর সরকার সংখ্যালঘু ছিল। মোদীজী চেষ্টা করলেও বিভিন্ন ফড়েদের লবি আন্দোলন করে চাষিদের ভুল বোঝায় এবং সরকারকে পিছিয়ে আসতে হয়। তবুও সরকার আগামীদিনে চাষিদের মুক্তি দেবার জন্য নতুন আইন আবার আনবে।

এবার আসি, শেষ ভাগ অর্থাৎ কোয়ার্টারনারি ক্ষেত্রে। সুযোগের অভাবে আমাদের দেশের সেরা মেধা বিদেশে গিয়ে গবেষণা করতো, আর সেই পেটেন্ট দেখিয়ে আমাদের করের টাকা নিয়ে চলে যেত পাশ্চাত্য দুনিয়া। প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করলেন, জাতীয় শিক্ষানীতি। ব্রিটিশদের তৈরি কেরানি তৈরির শিক্ষাকে উদ্ভাবনের শিক্ষায় পরিণত করার জন্য। ব্রিটিশ ভারতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বভারতী তৈরি করেন এই লক্ষ্য নিয়ে। এনসিই বেঙ্গল তৈরি করেন শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাসবিহারী ঘোষ, রাজা সুবোধ মল্লিক প্রমুখ, যা আজকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। এক সময় এই এনসিই বেঙ্গলের রাষ্ট্রীয় স্কুল থেকে ডাক্তারি পাশ করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার। অথচ, স্বাধীনতার পর সেই ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থাই চলছে আজও। এই অবস্থায় আনা হয় জাতীয় শিক্ষানীতি। আমেরিকা শুধু গবেষণা থেকে পেটেন্ট নিয়ে সেটা বেচে আমাদের দ্বিগুণ জিডিপি আয় করে। আর আমাদের সেরা মেধাকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছি আমরা। গত কয়েকবছরে ভারতীয় গবেষণা বেশ কিছু মাইলস্টোন ছুঁয়েছে। কোভিড ভ্যাকসিন তাঁর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। মহাকাশ ক্ষেত্রে মঙ্গলগ্রহ এবং চাঁদে যাওয়ার পর ভারতের সঙ্গে কাজ করতে চাইছে পৃথিবীর সব উন্নত দেশ। ৫০-এর উপর দেশ আমাদের কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবস্থাকে ব্যবহার করে তাঁদের টেলিকম ক্ষেত্র উন্নতি করছে। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আমাদের ব্রহ্মস/তেজস অস্ত্র পৃথিবীর সব দেশের কাছে আশ্চর্য। আমাদের ফার্মাসি গবেষণা আমেরিকার কাছে একটা অশনিসংকেত। শিক্ষাক্ষেত্রে বড়ো রকমের পরিবর্তন এনেছে ভারত সরকার।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা দশ বছরে ৭৬০ থেকে বেড়ে হয়েছে ১১৬৮। আইআইটি-র সংখ্যা ১৬ থেকে বেড়ে হয়েছে ২৩। আইআইএম-এর সংখ্যা ১৩ থেকে ২১। আইআইটি ৯ থেকে ২৫। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো, কংগ্রেস ৬০ বছর রাজত্ব করে দেশের দুটি AIIMS বানিয়েছে। দিল্লি ও রায়বেরিলি। বাকি সব রাজ্যের এই উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবাযুক্ত AIIMS-কে নিয়ে গেছে অটলজী ও মোদীজী। আআইটি, আইআইএম এবং আইআইটি-ও সারা দেশে ছাড়িয়ে দেবার কাজ শুরু করেন অটলজী এবং স্বপ্ন পূরণ করেন মোদীজী। ২০০০ সালে সর্বশিক্ষা মিশন শুরু করেন অটলজী এবং আজ মোদীজী ৯ বছর দেশ শাসনের পর ২৫ বছরের নীচের ভারতীয়দের ১০০ শতাংশ স্বাক্ষর হয়েছেন। নতুন শিক্ষানীতি অনুযায়ী, তিন বছর বয়স থেকে সব শিশু সরকারি স্কুলে যাবে এবং তাঁদের দেওয়া হবে ফর্টিফায়েড চালের ভাত, যাতে তারা সুষম পুষ্টি পায়। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে আরেক বড়ো বিপ্লব আয়ুষ্মান ভারত। একসময় দেশের বড়ো শহর ছাড়া কোথাও বেসরকারি বড়ো হাসপাতাল তৈরি হতো না, কারণ দেশের গরিব মানুষের কাছে চিকিৎসাবিমা ছিল না। আজ আয়ুষ্মানভারত পলিসি আসায়, বেসরকারি হাসপাতালে ছোটো শহর এবং গ্রামে বিনিয়োগ করছে।

এবার দেখা যাক, দেশের সাধারণ মানুষের কাছে কীভাবে উন্নত প্রযুক্তি পৌঁছে দিয়ে তাঁদের দারিদ্র্য দূর করেছেন মোদীজী। ২০২৩-এর রাষ্ট্রসঙ্ঘের তথ্য অনুযায়ী ভারতের দারিদ্র্য বহুগুণ কমেছে গত এক দশকে। এটা কি ম্যাজিক? শিক্ষা? নাকি সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনার ফলে আত্মনির্ভর হয়েছে দেশ। একে একে বিশ্লেষণ করা যাক :

১. জনধন অ্যাকাউন্ট খুলে তাকে আধার ও মোবাইলের (JAM TRINITY) সঙ্গে জুড়ে দেওয়ায় কমেছে দুর্নীতি। রাজীব গান্ধী বলেছিলেন সরকার ১০০ টাকা পাঠালে ১৫ টাকা মানুষ পায়। কিন্তু নরেন্দ্র মোদীক্ষ্ম-র প্রণীত JAM TRINITY-র ফলে ১০০ টাকা পাঠালে মানুষ ১০০-ই পায়। দেশের ৫০ শতাংশ মানুষের হাতে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ছিল না ২০১৪-র আগে। এই তথ্য সংসদে দেন দেশের প্রাক্তন মুখ্য আর্থিক উপদেষ্টা তথা প্রাক্তন যোজনা কমিশন প্রধান তথা প্রাক্তন রিজার্ভ ব্যাংক প্রধান তথা প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী তথা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিংহ ২০১৬-তে।

২. জ্যাম ট্রিনিটি ব্যবস্থার সঙ্গে মানুষকে দেওয়া হয় বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা, যা আগে আমেরিকা বা ইউরোপের দেশ পেত। জীবনবিমা, দুর্ঘটনা বিমা, চিকিৎসা বিমা, কৃষি বিমার কাগজ হাতে তুলে দেন নরেন্দ্র মোদী।

৩. আগে চাষি, ছোটো ব্যবসায়ী, মহিলা উদ্যোগপতিরা ধার নিতেন মহাজনদের থেকে। আজ তারা ধার নেন ব্যাংক থেকে। যে সুদ তারা সপ্তাহে দিতেন এখন সেটা বছরে দিতে হয়। ফলে বেড়েছে তাঁদের আয়। কমেছে জিনিসের দাম।

৪. ইন্টারনেট ডাটার দাম আজ ২০১৪-র তুলনায় ১ শতাংশ। এর ফলে হাতে প্রচুর তথ্য। প্রশিক্ষণের সুবিধা বেড়েছে ঘরে বসে। যে শিক্ষা নিতে আগে কোটা, দিল্লি, হায়দরাবাদ যেতে হতো, তা আজ পাওয়া যাচ্ছে ঘরে বসে প্রায় বিনা মূল্যে।

এক কথায় দেশের মানুষের জীবনে কিছু বড়ো মৌলিক পরিবর্তন এনেছেন প্রধানমন্ত্রী। ব্যাংক, বিমা, ইন্টারনেট ডাটা, উৎপাদনে উপযোগী বাস্তুতন্ত্র, সহজ কর ব্যবস্থা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বিপুল সুযোগ এবং নিয়ন্ত্রিত মুদ্রাস্ফীতি দেশকে এমন জায়গায় নিয়ে গেছে যে IMF, বিশ্বব্যাংক, রাষ্ট্রসঙ্ঘ তার প্রশংসা করতে বাধ্য হচ্ছে। ৩৭০ ধারা বিলোপ, তিনতালাক প্রথা বিলোপ নিয়ে এসেছে সামাজিক ন্যায়। শ্রীরামমন্দিরের পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানুষ পাচ্ছে সুশাসনের স্বাদ। অমৃতকালে অমৃতের আস্বাদ পেতে চলেছে এই দেবভূমির মানুষ। □

অযোধ্যায় শ্রীরামমন্দিরের পুনঃপ্রতিষ্ঠা রাষ্ট্রীয় গৌরবের প্রতীক

ডা: মোহন ভাগবত

বিগত দেড় হাজার বছরে আমাদের ভারতের ইতিহাস মূলত আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রামের ইতিহাস।

প্রথম দিকে সেইসব বিদেশি হানাদারদের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল এদেশের সম্পদ লুণ্ঠন; উদাহরণস্বরূপ আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের উল্লেখ করা যায়। কিন্তু ইসলামের নামে হওয়া পশ্চিমের আক্রমণ দেশের সমাজ-সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস ও বিভেদ সৃষ্টির করার কাজ করেছে। দেশের সামাজিক মনোবল নষ্ট করার জন্য ধর্মীয় স্থান ধ্বংস করা ছিল তাদের লক্ষ্য। তাই বিধর্মী বিদেশি আক্রমণকারীরা ভারতের মন্দিরগুলিকে ধ্বংস করে। এক-আধ বার নয়, এইসব অপশক্তি বহুবার এই অপকর্ম করেছে। তাদের লক্ষ্য ছিল ভারতীয় সমাজকে হতোদ্যম করা যাতে ভারতবাসী মানসিকভাবে সম্পূর্ণ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তারা তাদের উপর বির্বিঘ্নে শাসন করতে পারে।

এই একই উদ্দেশ্যে অযোধ্যায় শ্রীরামমন্দির ধ্বংস করা হয়েছিল। বিদেশি আক্রমণকারীদের এই অপকৌশল শুধু অযোধ্যা বা একটি মন্দিরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, বিশ্বের সর্বত্র তারা এই কাজ করেছে।

ভারতীয় শাসকরা কখনো কাউকে আক্রমণ করেননি, বরং বিশ্বের শাসকরা তাদের রাজ্য বিস্তারের জন্য আগ্রাসী হয়ে এমন অপকর্ম করেছে। কিন্তু তারা যেমনটি আশা করেছিল ভারতের মাটিতে তেমন ফল হয়নি। বরং এদেশের সমাজের আস্থা, আনুগত্য ও মনোবল নষ্ট হয়নি, সমাজ বিদেশি শক্তির কাছে মাথা নত করেনি, সাহসের সঙ্গে তাদের প্রতিরোধ ও সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছে। এই লক্ষ্যেই শ্রীরামজন্মভূমি উদ্ধার করে সেখানে মন্দির পুনর্নির্মাণের নিরন্তর প্রচেষ্টা চলেছে। এর জন্য অনেক যুদ্ধ, আন্দোলন ও আত্মত্যাগ হয়েছে; হিন্দুদের মনে শ্রীরামজন্মভূমি উদ্ধারের সংকল্প দৃঢ়তর হতে থেকেছে।

১৮৫৭ সালে যখন বিদেশি ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতির সময়, তখন হিন্দু-মুসলমান একত্রে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সংগঠিত করার বিষয়ে পারস্পরিক মতবিনিময় করেছিল। সেই সময়েই গোহত্যা নিষিদ্ধ করা এবং শ্রীরামজন্মভূমির মুক্তির বিষয়ে একটা সমঝোতার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। বাহাদুর শাহ জাফর তাঁর হলফনামায় গোহত্যা নিষিদ্ধ করার কথা অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। এসব কারণেই সমগ্র সমাজ একসঙ্গে লড়াই করেছে। সেই যুদ্ধে ভারতীয়রা বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করলেও দুর্ভাগ্যবশত সেই যুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভব হয়নি এবং ভারত স্বাধীনতা পায়নি। ব্রিটিশ শাসন কায়েম ছিল, কিন্তু শ্রীরাম মন্দির পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম থেমে যায়নি।

ব্রিটিশ তাদের নীতি অনুসারে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য যে 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' নীতি চালু করেছিল। এদেশের তৎকালীন অবস্থা অনুসারে সেই অপকৌশল আরও বেশি করে প্রয়োগ করা হলো। দেশের মানুষের ঐক্য ভাঙতে ব্রিটিশরা অযোধ্যায় সংগ্রামী বীরদের ফাঁসি দিয়েছিল। ফলত শ্রীরাম জন্মভূমির সমস্যার সমাধান হলো না। কিন্তু শ্রীরামমন্দিরের জন্য সংগ্রাম চলতেই থাকল।

১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর, যখন সর্বসম্মতিক্রমে সোমনাথ মন্দিরের সংস্কার করা হলো তখন থেকেই শ্রীরামমন্দির-সহ এই ধরনের অন্য মন্দিরগুলি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। শ্রীরাম জন্মভূমির মুক্তির বিষয়েও তখন ঐকমত্য তৈরি করে বিচার-বিবেচনা করা যেত, কিন্তু রাজনীতির গতিপথ বদলে গেল। বিভেদ,

বৈষম্য ও অরাজকতা সৃষ্টিকারী রাজনীতি ক্রমশ প্রকট হতে থাকল। শ্রীরাম মন্দিরের সমস্যাটি অমীমাংসিত থেকে গেল। দেশের পূর্ববর্তী নির্বাচিত সরকারগুলি এই বিষয়ে হিন্দু সমাজের ইচ্ছা ও অনুভূতিকে বিবেচনাই করেনি। উলটে সমাজের তরফে গৃহীত উদ্যোগকে বারবার দমন করার চেষ্টা হয়েছে। এ সংক্রান্ত আইনি লড়াই, স্বাধীনতা-পূর্ব সময় থেকেই চলেছে। শ্রীরাম জন্মভূমির মুক্তির জন্য সামাজিক আন্দোলন আশির দশকে শুরু হয় এবং দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে চলতে থাকে।

১৯৪৯ সালে রাম জন্মভূমিতে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের মূর্তি প্রকট হয়। ১৯৮৬ সালে আদালতের আদেশে মন্দিরের তালা খোলা হয়। পরবর্তী সময়ে বহু আন্দোলন ও করসেবার মাধ্যমে হিন্দু সমাজের নিরন্তর সংগ্রাম চলতে থাকে। ২০১০ সালে এলাহাবাদ হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত স্পষ্টভাবে সমাজের সামনে এসেছিল। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সমস্যাটি সমাধান করার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল। ৯ নভেম্বর ২০১৯, ৩০ বছরের আইনি লড়াইয়ের পরে, মহামান্য সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় সত্য ও তথ্য যাচাই করে একটি সুষম সিদ্ধান্ত দেয়। এই সিদ্ধান্তে উভয় পক্ষের ভাবাবেগ ও পরিস্থিতির বাস্তবতাও বিবেচনা করা হয়েছে। আদালত সব পক্ষের যুক্তিতর্ক শোনার পরই এই সিদ্ধান্ত দিয়েছে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মন্দির নির্মাণের জন্য একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়। শ্রীরাম মন্দিরের ভূমিপূজন ৫ আগস্ট ২০২০-তে হয়েছিল এবং গত পৌষ শুক্লা দ্বাদশী, যুগাব্দ ৫১২৫-তে অর্থাৎ ২২ জানুয়ারি ২০২৪-এ শ্রীরামলালার প্রতিমা স্থাপনা ও প্রাণপ্রতিষ্ঠার আয়োজন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রীরাম সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠের পূজ্য দেবতা এবং শ্রীরামচন্দ্রের জীবন এখনও সমগ্র সমাজের দ্বারা স্বীকৃত আচরণের আদর্শ। তাই এখন একটা ছোটো-খাটো বিরোধের জের ধরে যে বিরোধিতা দেখা দিয়েছে সেটি সমাপ্ত হওয়া উচিত। এরই মধ্যে যে তিক্ততা দেখা দিয়েছে তারও অবসান হওয়া উচিত। সমাজের প্রবুদ্ধ মানুষদের দেখতে হবে যে এই সমস্ত বিবাদের সম্পূর্ণ অবসান যেন হয়ে যায়। অযোধ্যা মানে 'যেখানে যুদ্ধ হয় না', 'সংঘাত মুক্ত স্থান'। এই কারণে অযোধ্যার পুনর্গঠন সমগ্র দেশের সাম্প্রতিকতম প্রয়োজন এবং এটি আমাদের সকলের কর্তব্যও বটে।

অযোধ্যায় শ্রীরামমন্দির নির্মাণের উপলক্ষ্যটি রাষ্ট্রীয় গৌরবের প্রতীক যা একপ্রকার নবজাগরণেরই প্রতীক। এটি, একদিকে আধুনিক ভারতীয় সমাজ জীবনের দৃষ্টিভঙ্গির আরও এক স্বীকৃতি যা শ্রীরামের চরিত্রের রূপকে নিহিত। 'পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ম্' পদ্ধতিতে মন্দিরে ভগবান শ্রীরামের পূজা করতে হবে আর মনোমন্দিরে শ্রীরামের আদর্শ স্থাপন করে তার আলোকে আদর্শ আচরণ অবলম্বন করে ভগবান শ্রীরামের পূজা করতে হবে, কারণ 'শিবো ভূত্বা শিবং যজেৎ, রামো ভূত্বা রামং যজেৎ'— একেই বলা হয় যথার্থ পূজা। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা হলে, ভারতীয় সংস্কৃতির সামাজিক প্রকৃতি অনুসারে, 'মাতৃবৎ পরদারেষু, পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ। আত্মবৎ সর্বভূতেষু, যঃ পশ্যতি সঃ পণ্ডিতঃ।।'

এভাবে আমাদেরও শ্রীরামের পথে চলতে হবে। জীবনে সততা, শক্তি ও পরাক্রমের (সাহসিকতার) সঙ্গে ক্ষমা, সদিচ্ছা ও নম্রতা, সকলের সঙ্গে আচরণে ভদ্রতা, হৃদয়ের কোমলতা এবং দৃঢ় হয়ে নিজের কর্তব্য পালন করা ইত্যাদি। আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য নিজেদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে শ্রীরামের গুণাবলী অনুকরণ করা। এটাকে সবার জীবনে আনতে হলে সততা, নিষ্ঠা ও কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।

আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনের কথা বিবেচনা করে সমাজ জীবনেও শৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে হবে। আমরা জানি যে একই শৃঙ্খলার শক্তিতে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ তাদের ১৪ বছরের বনবাস এবং শক্তিশালী রাবণের সঙ্গে সফল লড়াই পূর্ণ করেছিলেন। শ্রীরামের চরিত্রে প্রতিফলিত ন্যায় ও সহমর্মিতা, সম্প্রীতি, পক্ষপাতহীনতা, সামাজিক গুণাবলী আবার সমাজে পরিব্যাপ্ত করতে হবে। শোষণহীন সমান ন্যায়বিচারের উপর ভিত্তি করে শক্তির পাশাপাশি করুণার অধিকারী চতুর্বর্গ পুরুষার্থযুক্ত এক সমাজ গড়ে তোলা— এটাই শ্রীরামের প্রকৃত পূজা।

অহংকার, স্বার্থপরতা ও বৈষম্যের কারণে এই পৃথিবী ধ্বংসের উন্মত্ততায় ডুবে আছে এবং নিজের উপর সীমাহীন বিপর্যয় ডেকে আনছে। সম্প্রীতি, ঐক্য, অগ্রগতি ও শান্তির পথ দেখাচ্ছে জগৎ অভিরাম (সর্বাঙ্গসুন্দর) ভারতবর্ষ। আমাদের ভারতবর্ষের পুনর্গঠনের সর্বজনীন এবং 'সর্বেষাম্ অবিরোধী' অভিযানের আরম্ভ শ্রীরাম জন্মভূমিতে শ্রীরামলালার প্রবেশ এবং তাঁর প্রাণপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শুরু হতে চলেছে। আমরা সেই অভিযানের এবং বাস্তবায়নকারী সক্রিয় কার্যকর্তা। গত ২২ জানুয়ারি ভক্তিপূর্ণ উৎসবে আমরা সকলেই মন্দিরের পুনর্গঠনের পাশাপাশি ভারতের পুনর্গঠন করে সমগ্র বিশ্বকে নবনির্মাণের পরিপূর্ণতা করার সংকল্প করেছি। আসুন, এই সচেতনতাকে মাথায় রেখে এগিয়ে যাই। জয় সিয়া রাম।

(লেখক সরসঙ্ঘচালক, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ)

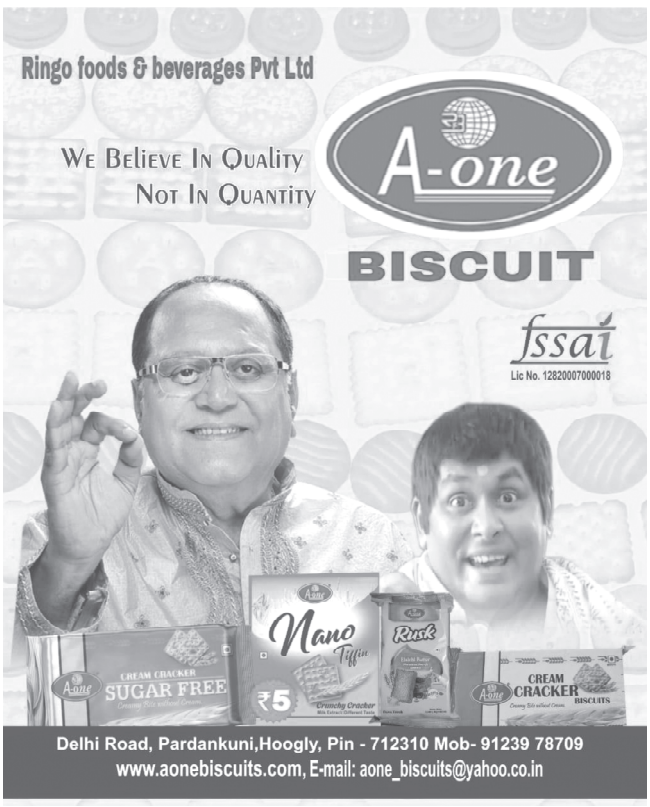

বুদ্ধির জয়

বোধিসত্ত্ব একবার কাশীতে রাজা ব্রহ্মদত্তের পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। এই সময় তাঁর নাম হয় ব্রহ্মদত্ত কুমার। ব্রহ্মদত্ত কুমার অত্যন্ত মেধাবী ও গুণী ছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি নানা বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠলেন।

রাজা ব্রহ্মদত্ত উপযুক্ত সময়ে পুত্রকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করলেন। সেই সময় বারাণসীতে মহাধুমধামে যাগযজ্ঞ, পূজাঅর্চনা করা হতো। আর সেই সব অনুষ্ঠানে দেবতাকে সন্তুষ্ট করা জন্য প্রচুর পরিমাণে ছাগল, কুকুর, শুয়োর, পাখি বলি দেওয়া হতো।

বোধিসত্ত্ব ধর্মের নামে, উৎসবের নামে প্রাণীহত্যা দেখে খুব কষ্ট পেতেন। তিনি ভাবলেন, তিনি যখন রাজা হবেন যেভাবেই হোক বন্ধ করবেন এই নিষ্ঠুর প্রথা।

ব্রহ্মকুমার একদিন নগর পরিভ্রমণে বেরিয়েছেন। হঠাৎ দেখলেন একটি গাছের নীচে দাঁড়িয়ে বহু লোক যে যার মনের বাসনা ব্যক্ত করছে। সকলের বিশ্বাস, ওই গাছে দেবতার বাস। ভক্তিভরে ডাকলে দেবতা মনের ইচ্ছা পূরণ করেন।

ব্রহ্মদত্তকুমার এইসব দেখে গাছের নীচে গিয়ে ফুল, চন্দন দিয়ে পূজা করলেন। এরপর থেকে তিনি প্রায়ই ওই গাছটিকে পূজা করতেন।

পিতার মৃত্যুর পর ব্রহ্মদত্তকুমার রাজা হলেন। তিনি মনে মনে ভাবলেন, এবার আমি আমার মনের ইচ্ছা পূরণ করতে পারি— জীবহত্যা আমাকে বন্ধ করতেই হবে।

একদিন ব্রহ্মদত্তকুমার কয়েজন মন্ত্রী এবং কয়েকজন ব্রাহ্মণকে ডেকে বললেন— আপনারা কি জানেন আমি কীভাবে রাজা হয়েছি? সকলেই একসঙ্গে বলে উঠলেন, না না, আমরা এব্যাপারে কিছুই জানি না। অনুগ্রহ করে যদি বলেন, আমরা খুশি হবো। রাজা ব্রহ্মদত্তকুমার বললেন, আমি একটি গাছকে প্রায়ই পূজা করতাম। ওই গাছটির আশীর্বাদেই আজ আমি রাজা।

তারপর তিনি বললেন, আমি ওই বৃক্ষদেবতাকে খুশি করতে চাই। আপনাদের একটা কাজ করতে হবে। ধর্মের নামে বা যে কোনোভাবে যারা প্রাণীহত্যা করে তাদের হৃৎপিণ্ড ও রক্ত দিয়ে আমি প্রতিদিন ওই বৃক্ষদেবতার পূজা করবো। আপনাদের তার ব্যবস্থা করতে হবে।

রাজার কথামতো সারা রাজ্যে এই কথা ঘোষণা করা হলো। লোকেরা রাজার ঘোষণা শুনে প্রাণীহত্যা বন্ধ করে দিল। সারা রাজ্যে প্রাণীহত্যা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল।

বোধিসত্ত্বরূপী ব্রহ্মদত্তকুমার খুব খুশি হলেন। কোনো মানুষকে শাস্তি না দিয়েই শুধুমাত্র বুদ্ধিবলে পশুহত্যার মতো অপরাধ বন্ধ হয়ে গেল।

সংগৃহীত

বীর বনবাসী

কেশরী চন্দ

স্বাধীনতা যোদ্ধা কেশরী চন্দের জন্ম ১৯২০ সালের ১ নভেম্বর উত্তরাখণ্ডের জৌনসার জেলার কেয়াওয়া গ্রামে। তিনি বাল্যকাল থেকেই অত্যন্ত সাহসী ছিলেন। কলেজে পড়ার সময় ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে নায়েব সুবেদার পদে ভর্তি হন। ১৯৪০ সালে তিনি জাপানি সেনার হাতে বন্দি হন। মুক্তি পেয়ে তিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ডাকে আজাদ হিন্দ বাহিনীতে যোগ দেন। ইম্ফলের যুদ্ধে আবার ব্রিটিশ সেনার হাতে ধরা পড়েন। বিচারের জন্য তাঁকে দিল্লিতে পাঠানো হয়। ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অপরাধে তাঁর ফাঁসির আদেশ হয়। মাত্র ২৪ বছর ৬ মাস বয়সে এই বীর যোদ্ধা ১৯৪৫ সালের ৩ মে ভারতমাতা কী জয় ধ্বনি দিয়ে ফাঁসিতে ঝুলে পড়েন।

এসো সংস্কৃত শিখি– ৮

ক্লীবলিঙ্গে

এতৎ কিম্?– এটা কী? **এতৎ গৃহম্**— এটা বাড়ি

এতৎ কিম্? – এতৎ ফলম্

এতৎ কিম্? — এতৎ পুস্তকম্।

এতৎ কিম্?— এতৎ গৃহম্

এতৎ—? — এতৎ কৃষ্ণফলকম্।

— কিম্?— এতৎ পত্রম্।

— —? — এতৎ দ্বারম্।

— —? -– এতৎ ব্যঞ্জনম্।

অভ্যাস করি—

চিত্রম্, পুষ্পম্, মন্দিরম্, যানম্, কঙ্কনম্, বস্ত্রম্, পাত্রম্, ছত্রম্, পর্ণম্, কাষ্ঠম্, মানচিত্রম্, শ্বেতফলকম্, বাহনম্, কর্গদম্।

ভালো কথা

কম্বল

গত কয়েকদিন থেকে খুব শীত পড়েছে। আমাদের স্কুলে যাবার পথে একটা দোকানের বারান্দায় একটি ভিখারি দাদু ঠকঠক করে কাঁপছিল। দাদুটি একটি ময়লা ও ছেঁড়া ধুতি পরে আছে, আবার সেটারই একটা দিক গায়ে জড়িয়ে রেখেছে। আমার দেখে খুব কষ্ট হচ্ছিল। স্কুল থেকে বাড়ি এসে মাকে বললাম। মা বলল, এরকম তো কত গরিব মানুষ আছে, কতজনকে দিবি? আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। আমাদের বাড়িতে তো কত কম্বল, একটা দিলে কী হবে। পরদিন স্কুলে যাবার সময় অবাক কাণ্ড। মা একটা কম্বল আমার হাতে দিয়ে বলল, ওই দাদুটাকে দিয়ে দিবি। আমি আর শালিনী স্কুলে যাবার সময় দাদুর গায়ে জড়িয়ে দিলাম। দাদু আনন্দে আমাদের শুধু দেখছিল।

শুভ্রা ঘোষ, ষষ্ঠশ্রেণী, ফারাক্কা ব্যারেজ কলোনি, মুর্শিদাবাদ।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

শীত

বিদিশা সরদার, একাদশ শ্রেণী, ক্যানিং , দঃ ২৪ পরগনা।

কলকাতাতে বেজায় শীত
সবাই হুহু কাঁপছে,
কাশ্মীরেতে নেইকো দেখা
সিকিম বরফে ভাসছে।
উত্তরে দক্ষিণে সবাই কাঁপছে
তারই মধ্যে বৃষ্টি,
দার্জিলিঙেও পড়ছে বরফ
একি অনাসৃষ্টি।

কেন এমন পরিস্থিতি
কিছুই বুঝি না,
ঠাম্মি বলেন বুঝতে পারবে
আর কটা দিন যাক না।
বাবা বলেন ঘোর অবিচার
গাছপালা সব শেষ
কলকাতাতেও পড়বে বরফ
হবে সবই শেষ।

লেখা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা ই-মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.
74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0556. Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

With Best Compliments from -

A
Well wisher

মোদী সরকারের লক্ষ্য বিকশিত ভারত
কৃষিতে স্বয়ম্ভরতা অর্জন শুধু সময়ের অপেক্ষা

সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী

মোদী সরকারকে ক্ষমতা গ্রহণের পর এক কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়েছে। আর সেটি হলো দারিদ্র্য। যদি একটু পেছনের দিকে তাকানো যায় তাহলে দেখা যায় উনিশ শতকের শেষ থেকে বিশ শতকের গোড়ার দিকে, ব্রিটিশরাজের শাসনে ভারতে দারিদ্র্য তীব্রতর হয়েছিল। স্বাধীনতার পর দীর্ঘ সময় ধরে কংগ্রেস দল ক্ষমতায় ছিল। এই দলটি বরাবরই পরিবারতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখার জন্য জাতীয় স্বার্থকে উপেক্ষা করেছিল। দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর সময় থেকে কংগ্রেস দারিদ্র্য দূর করার কথা বলে আসছিল। এখন রাহুল গান্ধীও একই কথা প্রচার করে চলেছেন। কিন্তু বাস্তব ও প্রমাণিত সত্য হলো যতক্ষণ না দেশ থেকে কংগ্রেসকে দূর করা যাচ্ছে অর্থাৎ দেশ যতদিন না পর্যন্ত কংগ্রেস-মুক্ত হচ্ছে, ততদিন দারিদ্র্য মুক্ত ভারত গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এ বাস্তব অবস্থা সারা ভারতের আপামর জনগণ অনুধাবন করেই মোদী সরকারকে স্বাগত জানিয়েছে।

২০১৪-তে নরেন্দ্র মোদীর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পথ চলাটা মসৃণ ছিল না। চরম দারিদ্র্য, দুর্নীতির প্রতিষ্ঠানিক রূপায়ণ, শিল্পের বিনাশ, ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা, স্বাস্থ্যের সংকট, বিনিয়োগ-বান্ধব হীনতা, বেকারত্ব, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নিরক্ষরতা, দরিদ্র কৃষক, ধনী-গরিবের বিস্তৃত ব্যবধান ছিল দলটির জন্য একটা চ্যালেঞ্জ। এছাড়াও ভৌগোলিক পরিবেশের বৈপরীত্য, সামাজিক সংগঠনের ত্রুটি প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, অপর্যাপ্ত আর্থিক নীতি। এছাড়াও অনুপ্রবেশ, রাজনৈতিক অস্থিরতা, রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি, বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং নারী শক্তিকে যথেষ্ট মর্যাদা না দেওয়া ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়গুলি ভারতে দারিদ্র বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত। এই দুরবস্থা হতে উত্তরণের জন্য 'আমাদের সংকল্প বিকশিত ভারত' শিরোনামে একটি বাস্তব কর্মসূচি মোদী সরকার গ্রহণ করেছে। এই কর্মসূচি অধিকাংশই সফল ভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ভারতবাসীকে নতুন স্বপ্নের দিশা দেখাচ্ছে।

এই কর্মসূচির মধ্যে (১) গরিবদের সেবা, প্রান্তিকদের সম্মান, (২) কৃষক কল্যাণ সুনিশ্চিতকরণ, (৩) নারীশক্তির ক্ষেত্রে নতুন গতি, (৪) ভারতের নব প্রজন্মের ক্ষমতায়ন, (৫) ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনযাত্রার সরলীকরণ, (৬) সবার জন্য সহজলভ্য স্বাস্থ্য পরিষেবা, (৭) সর্বাগ্রে দেশ-বিদেশ নীতি, জাতীয় সুরক্ষা, (৮) ভারত আন্তর্জাতিক অর্থ শক্তির কেন্দ্র, (৯) ব্যবসার সরলীকরণ, (১০) বিকাশ, (১১) ভারতের টেক-এড (টেকনোলজি এডুকেশন), (১২) উত্তর-পূর্ব অগ্রগতির চালক, (১৩) ঐতিহ্য ও বিকাশ, (১৪) পরিবেশ ও অস্তিত্ব অন্যতম ভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভারতের সামগ্রিক উন্নতির জন্য এবং তার সুফল ভারতবাসীকে সুচারুরূপে অংশীদার করার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে মোদী সরকার। গরিবদের কল্যাণের জন্য খাদ্য সুরক্ষা প্রকল্পের আওতায় গরিবদের জন্য মৌলিক পরিকাঠামো সৃষ্টি, ৮০ কোটি ভারতীয়ের খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা, আর্থিক অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে বিশ্বের বৃহত্তম উদ্যোগ গ্রহণ দুর্বল শ্রেণীর আকাঙ্ক্ষা পূরণ ও অধিকার রক্ষা, দিব্যাঙ্গদের ক্ষমতায়ন, জনজাতিদের সর্বব্যাপী উন্নয়ন সুনিশ্চিত করা, মৌলিক সুবিধা-সহ তিন কোটির বেশি গরিবকে আবাসন প্রদান বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ৮০ কোটি দেশবাসীর খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করেছে। খাদ্য নিরাপত্তা প্রকল্পের আওতায় 'এক দেশ এক রেশন কার্ড'-এর মাধ্যমে দেশজুড়ে বিনামূল্যে রেশন প্রদানের যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ সরকারের কর্মকাণ্ড সমূহের মধ্যে অন্যতম। ভারতের দারিদ্র্যকে পরিকল্পিতভাবে মোকাবিলা করার মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের দারিদ্র্যকে ৩২.৫৯ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৯.২৮ শতাংশ আনা হয়েছে। কৃষক কল্যাণ সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১৯ সালে একটি বিশেষ প্রকল্প পরিচালিত হয়। এই প্রকল্পের আওতায় তিনটি সমান কিস্তিতে বছরে কৃষকদের ৬০০০ টাকা প্রদান করা হয়। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনার আওতায় শস্য নষ্ট জনিত ক্ষতির জন্য কৃষকদেরকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়ে থাকে। জমির উর্বরতা বৃদ্ধির উপাদানসমূহের সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য মৃত্তিকা স্বাস্থ্য কার্ড চালু করা হয়েছে। সাধারণ মানুষের পুষ্টির কথা ভেবে এবং বিদেশে চাহিদা সৃষ্টির লক্ষ্যে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভায় ২০২৩ সালকে আন্তর্জাতিক মিলেট বর্ষ ঘোষণার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। ৭২টি দেশ ভারতের প্রস্তাবকে সমর্থন করে এবং ২০২১-এর রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভায় ২০২৩-কে আন্তর্জাতিক মিলেট বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। কৃষক কল্যাণে কিষাণ ক্রেডিট কার্ড বা কেসিসি এবং প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঁচাই যোজনা চালু করা হয়।

ভারতের ইতিহাসে একমাত্র মোদী সরকারই কৃষকের স্বার্থকে সুরক্ষিত করার মধ্য দিয়ে কৃষিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে। এতদিন কৃষক ছিল অভিভাবকহীন। তাঁদের জন্য কারোর তেমন মাথাব্যথা ছিল না। অথচ, এই কৃষকরা হলেন দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সৈনিক। তারা উৎপাদন করে কিন্তু ভোগ করে না। আগে কৃষকরা ছিলেন নিগৃহীত। বর্তমান সরকার তাদের মর্যাদার আসনে আসীন করেছেন। এ জয়যাত্রা অব্যাহত থাকলে অনতিবিলম্বে ভারত বিশ্ব কৃষি দরবারে শ্রেষ্ঠত্বের আসন লাভ করবে। □

কমিউনিস্টদের আর একটি কলঙ্কময় অধ্যায়

অপারেশান মরিচঝাঁপি

গোপাল চক্রবর্তী

১৯৫০-এর ফেব্রুয়ারি মাসের একটি দিন। বনগাঁ সীমান্ত দিয়ে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের অবিশ্রান্ত স্রোত। কয়েক লক্ষ উদ্বাস্তুর মাঝখানে যশোর রোডের ওপর দাঁড়িয়ে জওহরলাল নেহরু। তাঁর একপাশে গম্ভীর কিন্তু অনেকটাই ক্রুদ্ধ মুখে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, অন্যপাশে দাঁড়িয়ে সমান গম্ভীর চিন্তাক্লিষ্ট ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। নেহরু এই আর্ত অত্যাচারিত মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে অতি বিষণ্ণ সুরে বলেছিলেন— The partition of the country brought many evils at its train...। কিন্তু দেশবিভাগের দুষ্ট ক্ষত ৭৫ বছর ধরে বাঙ্গালির সমাজজীবনকে, তার মূল্যবোধ ও অনুভূতিকে কত ভাবে বিপর্যস্ত করেছে তা কিন্তু সেদিন নেহরু তাঁর অনুভূতি ও কল্পনায় ধরতে পারেননি। পেরেছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ।

এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে অনেক কাজ অসমাপ্ত রেখে অকালে তাঁকে বিদায় নিতে হয়েছিল কাশ্মীরের মাটিতে। ছিন্নমূলদের যন্ত্রণা উপলব্ধি করতে পেছিলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। সেই ১৯৫০ সালেই পূর্ববঙ্গের ছিন্নমূলদের এক নতুন স্থায়ী বাসস্থানের জন্য আন্দামানের কথা ভেবেছিলেন তিনি। প্রতিটি পরিবারের জন্য জমি এবং প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ হয়েছিল ভারত সরকারের সহায়তায়। কিন্তু বাদ সাধল কমিউনিস্টরা। তারা উদ্বাস্তুদের বোঝাল আন্দামানে যাওয়া মানে উপজাতিদের বিষাক্ত তিরে মৃত্যু নয়তো বাঘের পেটে কিংবা কুমিরের পেটে যাওয়া। উদ্বাস্তুরা বেঁকে বসলো আন্দামানে তারা যাবে না। কিছু কিছু উদ্বাস্তু রাজি হয়ে জাহাজে উঠল। কমিউনিস্টদের দল যাত্রী সেজে জাহাজে চড়ে বসল। জাহাজ মাঝ সমুদ্রে যেতে তারা বলল জাহাজ ফেরাও নয়তো আমরা সমুদ্রে ঝাঁপ দেবো। জেটিতে জাহাজ ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হলো নাবিকরা। বাঙ্গালিদের জন্য নতুন আর এক বঙ্গের সম্ভাবনা অধরাই থেকে গেল। তবে কমিউনিস্টদের প্ররোচনা উপেক্ষা করে যারা আন্দামানে পৌঁছে গিয়েছিল তারা আজ সেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত।

১৯৫৮ সালে বিধান রায় একজন দক্ষিণ ভারতীয় আই.সি. এসের পরামর্শে মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, মহারাষ্ট্রের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে থাকা দণ্ডকারণ্য নামে পরিচিত স্থানে উদ্বাস্তুদের পূণর্বাসন কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করে কেন্দ্র সরকারের সহযোগিতায় গঠন করলেন 'দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ'। বিধান রায়ের ইচ্ছানুযায়ী ভারতের প্রথম মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুকুমার সেনকে (আইসিএস) এই কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হলো। আরও কয়েকজন দক্ষ অফিসারের নেতৃত্বে পুনর্বাসনের কাজ সুষ্ঠুভাবে চলছিল। হতাশ উদ্বাস্তুরা কিছুটা আশার আলো দেখতে পেল। এই সময়ে সুকুমার সেনের আকস্মিক মৃত্যু এবং অন্যান্য কর্মদক্ষ অফিসারদের পদোন্নতি ও বদলির ফলে দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তু পূণর্বাসনের কাজ শিথিল হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে আর এক প্রথিতযশা অফিসার আইসিএস শৈবাল গুপ্তকে দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন কৃর্তৃপক্ষের দায়িত্ব দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও ভারত সরকার যৌথ ভাবে সিদ্ধান্ত নিল উদ্বাস্তুরা পুনর্বাসন চাইলে পশ্চিমবঙ্গে নয়, যেতে হবে দণ্ডাকারণ্যে।

১৯৬৪ সালে পূর্ববঙ্গে সংঘটিত হয় এক ভয়াবহ হিন্দু নরসংহার। নিহত হয় হাজার হাজার হিন্দু, ধর্ষিতা হয় হাজার হাজার মা-বোন। অগ্নিসংযোগ, লুঠপাট কিছুই বাদ যায়নি। জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে পশ্চিমবঙ্গের ১৪শো মাইল সীমান্ত দিয়ে আবার লক্ষ লক্ষ হিন্দু আশ্রয়ের জন্য পশ্চিমবঙ্গে আসতে লাগল। ১৯৬৪ সালের ফ্রেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে এই উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্যে পাঠাতে আরম্ভ করল পশ্চিমবঙ্গ ও ভারত সরকার। এই উদ্বাস্তুরা যাতে ট্রেন থেকে পালিয়ে যেতে না পারে সেই জন্য তাদের মালগাড়ির ওয়াগনে করে রায়পুর স্টেশনে পাঠানো হতে লাগল। প্রথম যেসব ওয়াগনে উদ্বাস্তুরা আসতে লাগল সেখানে হাজার বারোশো যাত্রীর মধ্যে ১০ থেকে ১২ জন করে মৃত উদ্বাস্তু দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের হাতে জমা পড়তে লাগল। একদিন সেই সংখ্যা দাঁড়াল ৫০-এর উপর। এবার শৈবাল বাবু প্রমাদ গুনলেন। তিনি রেডিয়োগ্রামে পশ্চিমবঙ্গ ও কেন্দ্রীয় সরকারকে কিছুদিনের জন্য উদ্বাস্তু পাঠানো বন্ধ রাখতে বললেন। সরকারের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় শৈবাল গুপ্ত তখন পদত্যাগ করেন। তাঁর পদত্যাগের ফলে দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন আরও অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। বাসস্থান নেই, প্রয়োজনীয় রিলিফ নেই, চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই, নেই পানীয় জলের সুব্যবস্থা, এক কথাই জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় কিছুই নেই। আছে শুধু প্রশাসনের নৃশংসতা, স্থানীয় আদিম অধিবাসীদের হিংস্র আক্রমণ। একরাতে সিআরপিএফ-এর জওয়ানরা এক উদ্বাস্তু তরুণীকে তুলে নিয়ে যায় তার প্রতিবাদ করতে গেলে সিআরপির গুলিতে কয়েকজন উদ্বাস্তুর মৃত্যু হয়। এই দুর্বিষহ পরিস্থিতিতে উদ্বাস্তাদের হয়ে ১৯৬৭ থেকে ১৯৬৯ সালে প্রথম ও দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের আমলে অজয় মুখার্জী ও জ্যোতিবসু একটি বাক্যও ব্যয় করেননি।

১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ও দণ্ডকারণ্য নিয়ে উচ্চবাচ্য করেননি।

এই সময়ে দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তু শিবিরে হাজির হলেন পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের বিতর্কিত মন্ত্রী রাম চ্যাটার্জি। উদ্বাস্তুদের বললেন— পশ্চিমবঙ্গে আমরা বামপন্থীরা ক্ষমতায় এসেছি। আমরা তখনও বলেছি এখনও বলছি পশ্চিমবঙ্গের মাটিতেই উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন চাই। দুর্বিসহ জীবনযাত্রার মধ্যে উদ্বাস্তুরা হয়তো একটু আশার আলো দেখলো। ১৯৭৮-এর ফেব্রুয়ারির একেবারে শেষে দণ্ডকারণ্যের মানা শিবির থেকে কয়েকশো উদ্বাস্তু বম্বে মেল ও এক্সপ্রেস ট্রেন ধরে পৌঁছয় হাওড়া স্টেশনে। সেই শুরু, তারপর থেকে প্রায় প্রতিদিন উদ্বাস্তুরা কাতারে কাতারে আসতে থাকে দণ্ডকারণ্য থেকে। স্টেশনের প্লাটফর্ম, রাস্তার ধার, এমনকী ময়দান সর্বত্র উদ্বাস্তু। দণ্ডকারণ্য ফেরত উদ্বাস্তুর সংখ্যা তখন প্রায় ৫০ হাজার। এক একটি বিরাট অংশ হাসনাবাদ রেলস্টেশনে স্টেশন ও ইচ্ছামতী নদীর পাড়ে এসে জমায়েত হয়। সবার গন্তব্য মরিচঝাঁপি।

সুন্দরবনের গভীরে করানখালি নদীর ওপর মরিচঝাঁপি দ্বীপ এখন দণ্ডকারণ্য থেকে পালিয়ে আসা উদ্বাস্তাদের নতুন আশ্রয়। কয়েক হাজার উদ্বাস্তু এখানে সরকারি নারকেল আর ঝাউ বাগানের ফাঁকে ফাঁকে নিপুণ হাতে ছোটো ছোটো কুটীর বানিয়েছে বনের বাঁশ আর ঘাসপাতা দিয়ে। যে মরিচঝাঁপি এতদিন অরণ্যের নিস্তব্ধতায় মৌন ছিল, আজ সেখানে শিশুদের কলরব। ঘর বানানোর ব্যস্ততা, সর্বহারাদের হাহাকারে মুখরিত অরণ্যভূমি। বসতিস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছে অস্থায়ী দোকান। চাল, ডাল, নুন, তেল সব বিক্রি হচ্ছে হাসনাবাদ থেকে এনে। স্থানীয় লোকেরা আসছে তরিতরকারি উদ্বাস্তুদের কাছে বিক্রি করতে। উদ্বাস্তুরা মাছ ধরছে, কাঁকড়া ধরছে নিজেদের খাওয়ার মতো রেখে বাকিটা বিক্রি করছে। সব থেকে বড়ো সমস্যা জলের, পানীয় জল আর রান্নার জল। তিন-চার মাইল দূরে নদীর ওপারের গ্রাম থেকে নৌকায় জল নিয়ে আসছে সারাদিন ধরে। উদ্বাস্তুর সংখ্যা ক্রমে বেড়েই চলেছে। স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে ওরা সহজে মিশে গেল। উদ্বাস্তুদের বেশিরভাগ খুলনা জেলার লোক। আর স্থানীয়রাও খুলনার। কয়েক পুরুষ আগে ব্রিটিশরা তাদের এনেছিল সুন্দরবনের জঙ্গল পরিষ্কার করার জন্য। উদ্বাস্তু মিস্ত্রিরা অল্পদিনের মধ্যে তৈরি করে ফেলেছে এক নৌকা তৈরির কারখানা। ছোটো বড়ো নানা রকমের নৌকা তৈরি হচ্ছে। জনবিরল মরিচঝাঁপিতে অল্প কালের মধ্যেই গড়ে ওঠে বসবাসযোগ্য এক রিফিউজি কলোনি'। পরিকাঠামো উন্নয়ন বা নির্মাণের ক্ষেত্রে রাজ্য বা কেন্দ্র সরকারের কোনোরূপ সাহায্য ছাড়াই ছিন্নমূল মানুষগুলো শুধুমাত্র পরিশ্রম দিয়েই মরিচঝাঁপিতে গড়ে তুলেছিল বিদ্যালয়, পাউরুটি তৈরির ছোটো কারখানা, অনেক ছোটো ছোটো কুটির শিল্প। তৈরি করেছিল কাঁচা রাস্তা। বাঁধ দিয়ে মাছচাষের ব্যবস্থাও তারা করেছিল। প্রথমে জলের সমস্যা থাকলেও নিজেদের চেষ্টা এবং কিছু সহানুভূতিশীল মানুষের আর্থিক সাহায্যে বেশ কয়েকটা নলকূপও বসিয়েছিল। এই উদ্বাস্তু পরিবারগুলো প্রায় সবাই ছিল নমশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষ এবং পুরুষানুক্রমে কায়িক শ্রমে অভ্যস্ত। রুচিশীল এই মানুষগুলো ছবির মতো সাজিয়েছিল তাদের নতুন বসতি। নতুন নাম দিয়েছে 'নিউ নেতাজী নগর'।

এই ছিন্নমূল মানুষগুলো যারা দণ্ডকারণ্যে বাঁচার আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল, তারা যখন আবার নতুন করে মরিচঝাঁপিতে বাঁচার স্বপ্ন দেখছে। তখন একদিন মরিচঝাঁপিতে এলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যসচিব অমিয় কুমার সেন। তিনি উদ্বাস্তুদের অবস্থা সরজমিনে দেখতে এসেছেন। কয়েক হাজার উদ্বাস্তুর সমাবেশে তিনি বললেন— দণ্ডকারণ্যের পুনর্বাসন সম্পর্কে উদ্বাস্তুদের যে সকল অভিযোগ আছে, তা যদি দূর হয় এবং স্থায়ী প্রতিকারের ব্যবস্থা হয় তবে উদ্বাস্তুরা কি দণ্ডকারণ্যে ফিরে যাওয়ার কথা নতুন করে ভাববেন? সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার কণ্ঠে জবাব— না, না, না। —'না-না-না'।

মুখ্যসচিব রিপোর্ট পাঠালেন সরকারের কাছে। সরকার (বামফ্রন্ট) এবার নড়েচড়ে বসলেন। দণ্ডকারণ্য থেকে আবার ছিন্নমূল হয়ে আসা মানুষগুলির সঙ্গে মিলেছিল প্রতিবেশী দ্বীপ সাতজেলিয়া, কুমিরমারি, ঝড়খালির বাসিন্দারা। দুই তরফে ছিল 'fraternal boarding'। দ্বীপবাসীরা দণ্ডকারণ্য-আগত উদ্বাস্তুদের মধ্যে দেখেছিল নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা, অধিকার অর্জনে জন্য লড়াইয়ের ক্ষমতা। এরা ছিল অনেক বেশি করিৎকর্মা। তাদের মধ্যে ছিল কলকাতার শাসকশ্রেণীর মুখোমুখি হওয়ার মতো নৈতিক সাহস। প্রতিবেশী দ্বীপসমূহের বাসিন্দারা বিস্মিত হয়ে দেখেছিল যে উন্নয়ন তাদের জীবনে ঘটেনি এই উদ্বাস্তুরা কয়েক মাসের মধ্যে তা মরিচঝাঁপিতে ঘটাতে পেরেছে। কিন্তু এই স্বাবলম্বী বসতি থেকে উদ্বাস্তুদের উৎখাতের জন্য রচিত হয় সরকারি ষড়যন্ত্র। নেমে আসে অমানবিক দমনপীড়ন। এই উৎখাতের একটা পালটা যুক্তিও বামফ্রন্ট সরকার জনসমক্ষে প্রচার করে। সেই যুক্তি হলো পরিবেশ সংরক্ষণের, বনরক্ষা আইন লঙ্ঘনের। মরিচঝাঁপিতে আশ্রয় নেওয়া ছিন্নমূল মানুষদের অভিযুক্ত করা হয়, তারা হোমল্যান্ড দাবি করছে, পালটা সরকার গঠন করছে। ১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু জানান, কোনো সরকার নিজের এলাকায় কোনো সমান্তরাল সরকারকে বরদাস্ত করতে পারে না। আর এক বামনেতা বিনয় চৌধুরী আরও এক কাঠি উপরে গিয়ে বললেন 'মরিচঝাঁপি' উদ্যোগের পেছনে বিদেশি চক্রান্ত আছে। তারা নাকি বাংলাদেশের সঙ্গে চোরাচালানে লিপ্ত, তারা নাকি বনসম্পদ নষ্ট করছে। অথচ সেখানে জ্বালানি যোগ্য আগাছা ছাড়া কোনও বনসম্পদ ছিল না। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তারা ব্যাঘ্র প্রকল্পের ক্ষতি করছে। এই অভিযোগ সম্পর্কে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছিলেন শৈবাল গুপ্ত। তাঁর জিজ্ঞাসা 'যেখানে গাছপালা নেই এবং ষাট-সত্তর বছরের মধ্যেও এমন গহন অরণ্য গড়ে ওঠবার সম্ভাবনা নেই, যেখানে সুদূর ভবিষ্যতের ব্যাঘ্র প্রজনন বৃদ্ধির অজুহাতে ছিন্নমূল মানুষের বর্তমান প্রয়োজন অগ্রাহ্য করা যায় কোন যুক্তিতে? হঠাৎ কেন মানুষের চেয়ে বাঘ দামি হয়ে উঠল জনদরদি বামপন্থীদের কাছে কে জানে। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর পশুপ্রেম সর্বজনবিদিত। শেয়ালের ডাকে ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে বলে সশস্ত্র পুলিশ পাঠিয়ে সল্টলেকের ঝোপ থেকে নিরীহ শেয়ালের বংশ ধ্বংস করেছিলেন। এই উদ্বাস্তুদের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ, তারা সরকারি জমি জবরদখল করেছে। অথচ কলকাতার আশেপাশের সমস্ত জবরদখল বাম মদতেই হয়েছে। যে মন্ত্রী রাম চ্যাটার্জী দণ্ডকারণ্যে গিয়ে এই ছিন্নমূলদের এ রাজ্যে ফেরার নিমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছিলেন তিনি এইবারও কোনো কথা বললেন না। বিধান

LAUREL

With Best Wishes From-

PRAKASH-PRAMOD BAID

Laurel Securities Private Limited

(Member of National Stock Exchange of India Ltd.)

LAUREL ADVISORY SERVICES
PRIVATE LIMITED
(Investment Advisor Mutual Fund Distributor)

JAIN BAID & COMPANY
(Chartered Accountants)

909-910, Diamond Heritage, 16, Strand Road, 9th Floor, Kolkata - 700001
Phone No. 66153334-39, Fax No. 66153341 Email ID - prakash_laurel@yahoo.com

With Best Compliments from -

Harshavardhan Neotia

রায়ের কাছে বামপন্থীরাই বার বার দাবি তুলেছিল উদ্বাস্তুদের আন্দামান কিংবা দণ্ডকারণ্যে পাঠানো চলবে না, এই পশ্চিমবঙ্গেই এদের পুনর্বাসন দিতে হবে। এদিকে সিপিআই (এম) নেতা আরেক এক উদ্ভট অভিযোগ করেন— বাংলাদেশের উগ্রপন্থী নেতা তোহা-র লোকেরা 'মরিচঝাঁপিতে যাওয়া আসা করছে। তিনি বলেন মরিচঝাঁপি বাংলাদেশের খুলনা সীমান্তে। খুলনায় উগ্রপন্থীদের একটা বড়ো ঘাঁটি রয়েছে। ১৯৭৯-এর জানুয়ারি মাসের শেষ দিকে নতুন উদ্যমে মরিচঝাঁপিতে রাজ্য প্রশাসন ঝাঁপিয়ে পড়ল। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির অবিসংবাদী নেতা জ্যোতি বসুর সরকার ছিন্নমূল মানুষগুলির বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ সৃষ্টি করল। এই দ্বীপটিতে কোনো খাদ্য, পানীয় জল, ওষুধ এবং অন্যান্য জীবনদায়ী পণ্য সামগ্রীর প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে কড়া পুলিশি পাহারায় দ্বীপটিকে ঘিরে ফেলা হলো। ওই দ্বীপের অসহায় মানুষগুলোর প্রতিবাদ প্রতিরোধকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য ১৪৪ ধারা ঘোষিত হলো। মরিচঝাঁপির কাছাকাছি মোল্লাখালি, কুমিরমারিতে কড়া নজরদারি চালু হলো। সিপিএম ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, রামকৃষ্ণ মিশনের সেবা কাজ বন্ধ করে দিল।

২৪ জানুয়ারি সকাল থেকেই সীমান্ত রক্ষীবাহিনী, উপকূলরক্ষী বাহিনী প্রভৃতির বড়ো বড়ো স্টিমার-সহ প্রায় ত্রিশটি জলযান থেকে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়ে এবং বহু কাঁচা ঘরবাড়ি ভেঙে গুড়িয়ে দিয়ে বহু মানুষকে গ্রেপ্তার করে ক্রমাগত অত্যাচারের তীব্রতা বাড়িয়ে তুলল। তাদের নৌকাগুলিকে ডুবিয়ে দিয়ে মাছ ধরার সরঞ্জাম ও টিউবওয়েলগুলো নষ্ট করে ফেলা হয়। প্রায় সাতদিন যাবৎ ধারাবাহিক ভাবে এই এক তরফা আক্রমণ চলে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ৩১ জানুয়ারি অনাহারে অনিবার্য মৃত্যুর করালগ্রাস থেকে আপন সন্তানদের বাঁচানোর জন্য নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার কেটে কুমিরমারী দ্বীপে যাবার চেষ্টা করেছিলেন বহু সংখ্যক মহিলা। পুলিশ ও আধা সামরিক বাহিনীর বীরপুঙ্গবেরা দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে উন্মত্তের মতো আক্রমণ করল ওই মায়েদের উপর। ক্ষুধার্ত ও অবসন্ন মহিলাদের ওপর ক্রমাগত নিষ্ঠুর আঘাত করে তাদের অনেককেই ডুবিয়ে মারা হলো। পরিবারের মহিলাদের ওপর এই অমানবিক অত্যাচার প্রতিহত করার জন্য যে সব পুরুষ সেদিন জীবন তুচ্ছ করে এগিয়ে এসেছিল তাদের পরিণতি হয়েছিল আরও ভয়াবহ। 'অপারেশন মরিচঝাঁপি' দুষ্কর্মে সেদিন পুলিশের সঙ্গী হয়েছিল সিপিএমের ক্যাডার বাহিনী। অত্যাচারের সঙ্গে সঙ্গে তারা চালিয়েছিল অবাধ লুটপাট আর ঝুপড়িগুলিতে অগ্নিসংযোগ। এ যেন ৭১-এর পূর্ববঙ্গের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক হানাদারদের হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা আক্রমণ। সেদিনও নির্বিচারে গুলি চলেছিল, অগ্নি সংযোগ, লুঠপাট সবই হয়েছে। সেদিন পাক হানাদারদের সঙ্গী ছিল স্থানীয় রাজাকার, মুসলিম লিগ আর জামাতে ইসলামির ক্যাডাররা। জন্মভূমিতে এরকম আক্রমণ ধারাবাহিকভাবে হয়েছে। তাই ধর্ম, মানসম্ভ্রম রক্ষা করতে আর আক্রমণের হাত থেকে বাঁচতে তারা দেশত্যাগ করেছিল। তারা দেশভাগের শিকার, কিন্তু দেশভাগের জন্য কোনো ভাবেই দায়ী নয়। মরিচঝাঁপির আশেপাশের গ্রামবাসীদের স্মৃতিতে এখনও সেই ঘটনা সমুজ্জ্বল। তাদের ভাষায় সে ছিল এক অসম যুদ্ধ। একপক্ষের হাতে ছিল শাসনক্ষমতা, ছিল সুশিক্ষিত বাহিনী, পর্যাপ্ত যুদ্ধোপকরণ, অপর পক্ষের কিছুই ছিল না— ছিল কেবল দুটো হাত ও নিজেদের মধ্যে অটুট সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন। এই একতরফা যুদ্ধে পুলিশের গুলিতে ৩১ জানুয়ারি ঠিক কতজন মারা গেছে তার হিসাব নেই, জলে ডুবে কিংবা হাঙর কুমিরের পেটেই-বা কত জন গেছে, পুলিশ কত মৃতদেহ লোপাট করেছে, সেই সংখ্যা অজানাই থেকে গেছে। তবে একটা সরকারি পরিসংখ্যানে পাওয়া যায়, কলাগাছিয়ায় ন'টা মৃতদেহ ভেসে উঠেছে আর ২০টি মৃতদেহ পুলিশ সন্দেশখালিতে নিয়ে গেছে। এছাড়া ২৭ জন অবরোধের ফলে অনাহারে মারা গেছে বলে একটি তথ্য পাওয়া যায়। ১৯৭৭-এ ক্ষমতায় আসার পর প্রথম গণহত্যার স্বাদ পেলেন জ্যোতি বসু এবং তাঁর বামফ্রন্ট সরকার। বামফ্রন্ট আমলে যতগুলো গণহত্যার ঘটনা ঘটেছে তার সঙ্গে মৌলিক পার্থক্য আছে মরিচঝাঁপি গণহত্যার। তা হলো বামফ্রন্ট নেতারাই দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তুদের নিয়ে এসেছিলেন সুন্দর বনের মরিচঝাঁপিতে। কয়েক মাস যেতেই 'স্বাধীনতার বলি' হওয়া আশ্রয়হীন, পিছিয়েপড়া মানুষগুলোর উপর সরকারের পুলিশ, সিপিএমের ক্যাডার আর পোষা গুণ্ডারা ঝাঁপিয়ে পড়তে শুরু করল। হত্যা, লুঠ, ধর্ষণ কোনোকিছুই বাদ গেল না। বন্ধুর ছদ্মবেশে এমন নৃশংসতা ইতিহাসে বিরল। এর সঙ্গে জড়িত কোনও আমলা বা রাজনীতিকের বিরুদ্ধে এর পরেও কোনও মামলা দায়ের করা হয়নি। এমনকী কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থন হারানোর ভয়ে প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই পর্যন্ত এই বিষয়টাকে নিয়ে অগ্রসর হতে চাননি। □

শ্রীরামচন্দ্রের পূজা ও করসেবকদের সম্মান প্রদর্শন

অযোধ্যায় নবনির্মিত শ্রীরামমন্দিরে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা কার্যক্রমের শরিক হিসেবে জগদ্দল-ভাটপাড়া নগরের উদ্যোগে জগদ্দল কোয়ার্টার দুর্গামন্দিরে শ্রীরামচন্দ্রের পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ধর্ম জাগরণ মঞ্চের দক্ষিণবঙ্গের প্রান্ত সংযোজক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ব্যারাকপুর জেলার সংযোজক পিনাকী চ্যাটার্জী, কাঁচরাপাড়া স্বামী বিবেকানন্দ মিশনের সন্ন্যাসী শক্তি মহারাজ, আঁতপুর মন্দিরের জলহারিবাবা, সঞ্জয় শাস্ত্রীসহ শত শত রামভক্ত। এই অনুষ্ঠানে ২২ জন করসেবককে সম্মান জানানো হয়। সন্ধ্যেবেলা সমিতির উদ্যোগে ভাণ্ডারার আয়োজন করা হয়েছিল। এই ভাণ্ডারার মাধ্যমে উপস্থিত রামভক্তদের সঙ্গে বহু স্থানীয় মানুষ প্রসাদ গ্রহণ করেন।

বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যৎ ভারতের সম্ভাব্য রূপরেখা

ড. দেবপ্রসাদ চৌধুরী

ভারতের সুদীর্ঘ হিমালয় সীমান্তে চীনা উপদ্রব এখন প্রায় নিয়মিত ব্যাপার হয়ে উঠেছে। গালওয়ান উপত্যকা হতে চীনা-সৈন্য সরে যাওয়ায় পরিস্থিতি এখন আপাতত শান্ত। কিন্তু এটা মনে করলে খুবই ভুল হবে যে চীন তার বদমতলব ত্যাগ করেছে। বর্তমান পৃথিবীতে চীনই হলো একমাত্র দেশ যেটি কেবল আজও টিকে থাকা একমাত্র ভূ-সাম্রাজ্যবাদী দেশ। চীনের এই আগ্রাসী ভূমিক্ষুধা এতই প্রবল যে উনিশ শতকে প্রবল পশ্চিমি সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণে যখন খুবই শক্তিহীন তখনও ১৮৯০-এর দশকে সিংকিয়াঙের দক্ষিণ সীমা হিসেবে তাদের দ্বারাই স্বীকৃত কুয়েনলুং পর্বতমালাকে ব্রিটিশদের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে অতিক্রম করে কিরঘিজ ইত্যাদি স্বাধীন তুর্কি জাতি অধুষিত একটি বড়ো ভূভাগ দখল করে আরও দক্ষিণে কারাকোরাম পর্বতমালা পর্যন্ত এগিয়ে আসে।

ব্রিটিশদের ইঙ্গিতের কারণ ছিল ওই স্থানটি যাতে রাশিয়া দখল করে ভারত সীমান্তের কাছে না এসে যায়। এই দুর্দমনীয় বিস্তার যে কিছুতেই মেটবার নয় তার প্রমাণ তথাকথিত কমিউনিস্ট চীনও দিল যখন ১৯৫০ সালে তিব্বতকে 'মুক্ত' করার ভণ্ড অছিলায় রক্তাক্ত অভিযানে নিরীহ তিব্বতকে দখল করার পরে ১৯৬২ সালে জওহরলাল নেহরুর দুর্বলতার সুযোগে ভারতের লাদাখ অঞ্চলের ৩০ হাজার বর্গমাইলের বেশি আক্সাই চীন দখল করল। কিন্তু চীনের সাম্রাজ্যবাদী ক্ষুধা নিবৃত্ত হবার নয়। তারপর শুরু হলো নিরন্তর হিমালয় সীমান্তে সিকিম, ভুটান, অরুণাচল ইত্যাদি অঞ্চলে অনুপ্রবেশের চেষ্টা। একই সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রতিবেশী দেশসমূহে যথা, মায়ানমার, ভিয়েতনাম ইত্যাদির ওপরেও চাপ সৃষ্টি করতে লাগল। এর পেছনে কাজ করছিল চীনের একটি গূঢ় লালিত ধারণা যা প্রতিফলিত হয়েছিল তাদের প্রকাশিত একটি মানচিত্রে। এই মানচিত্রে দেখানো হয় এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল যা নাকি একদা চীনের প্রভাবাধীন ছিল কিন্তু পশ্চিমি সাম্রাজ্যবাদের চাপে সেসব অঞ্চল চীনের প্রভাবমুক্ত হয়ে যায়, অর্থাৎ মাওবাদী চীনের গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল সেই সব অঞ্চল আবার দখল করা।

সুতরাং ভারতীয় সেনার হাতে প্রচণ্ড মার খেয়ে বিশ্বজনমতের চাপে আজ চীন গালওয়ান থেকে সরে গেলেও ভবিষ্যতে চীন আবার ভারত সীমান্তে হামলা চালাবে, এটা ধরে নেওয়া যায় যতদিন চীন তিব্বত অধিকার করে থাকবে।

এ পর্যন্ত আমরা অতীত ইতিহাস আলোচনা করলাম। এবার এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারত ভবিষ্যতে কী ধরনের অবস্থার মুখে পড়তে পারে তা অনুমান করতে হবে। বর্তমান প্রতিবেদকের মতে ভবিষ্যতে একটি বড়ো আকারের চীন-ভারত যুদ্ধ এড়ানো সম্ভব হবে না একগুঁয়ে সম্প্রসারণশীল চীনের সামরিক নীতির জন্য। এই যুদ্ধে দুই দেশই বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে নিশ্চিতভাবে। ভারতবর্ষের পূর্বাংশের ওপর এই যুদ্ধ বিশেষভাবে বিধ্বংসী হবে। কারণ উত্তরে নাথু-লা হতে চীনারা দক্ষিণে ভারতের অতি দুর্বল স্থান Chicken's Neck-এ আসার চেষ্টা করবে যাতে সমগ্র পূর্বভারতকে বাকি ভারত হতে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া যায়। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে চীনা নৌবাহিনী ভারতের পূর্বভাগ আক্রমণ করতে পারে।

কিন্তু ভারতের পক্ষে এই ভয়ানক বিপদ ছাড়া আরও দুটি সম্ভাব্য ঘটনা ঘটতে পারে যা সারা বিশ্বে আলোড়ন ফেলবে। প্রথমত, এই যুদ্ধের চাপে এবং অভ্যন্তরীণ ক্ষোভের বিস্ফোরণে চীনের বর্তমান শাসন ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়তে পারে। সেই দুর্বলতার সুযোগে অ-হান অঞ্চলগুলি যথা, অন্তর্মঙ্গোলিয়া, সিংকিয়াং এবং বিশেষত তিব্বত চীন থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। তিব্বত পুনরায় স্বাধীন হলে ভারতের হিমালয় সীমান্ত ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল অনবরত চীনা বিপদ হতে মুক্তি পাবে। দ্বিতীয়ত, এই ভীষণ যুদ্ধের ফলে চীনের সকল পাপকাজের দোসর পাকিস্তান লুপ্ত হবে। সিন্ধ ও বালুচিস্তান অবশ্যই পাকিস্তানের হাত থেকে বেরিয়ে যাবে। পাঠানরাও বিদ্রোহ করতে পারে। শেষপর্যন্ত স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করার চেষ্টা করবে পশ্চিম পঞ্জাব, কিন্তু বেশিদিন তা হয়তো সম্ভব হবে না। পাকিস্তানের এই ভগ্নাংশগুলির শেষ পরিণতি কী হবে, সেটা অনেকটাই নির্ভর করবে ভারতের নিজস্ব শক্তি ও কূটনীতির ওপর। এরা হয়তো কিছুকাল স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করবে। কিন্তু উত্থানশীল, শক্তিশালী ভারতের চৌম্বকীয় আকর্ষণ এবং অতীত ইতিহাসকে হয়তো দীর্ঘকাল উপেক্ষা করতে না পেরে শেষপর্যন্ত ভারতের সঙ্গে যোগ দিতে আগ্রহী হবে। এবং ঠিক এখানেই আমরা বর্তমান প্রসঙ্গের তৃতীয় পর্যায়ে এসে যাচ্ছি। আমরা জানি এই সবই মুসলমান প্রধান অঞ্চল। এরা যদি ভারতের সঙ্গে যোগ দেয় তাহলে ভারতে হিন্দুরা অবশ্যই সংখ্যালঘু এবং মুসলমানরা সংখ্যাগুরু হয়ে যাবে। ফলে ভারত দারুল ইসলামে পরিণত হবে। ভারত দারুল ইসলামে পরিণত হলে তার যে সনাতনী চরিত্র আবহমানকাল সংখ্যাগুরু হিন্দুদের মাধ্যমে রক্ষিত হয়েছে তা ধ্বংস হয়ে যাবে এবং ভারত আর মূলত ভারত থাকবে না। ভবিষ্যতের এই সম্ভাবনা এড়াতে হলে ভারতের বর্তমান বহুছিদ্রযুক্ত সংবিধানকে এমনভাবে সংশোধন করতে হবে যাতে ভারতের চিরকালীন সনাতন হিন্দু সুরটি বজায় থাকে, ভবিষ্যতে যত ঐতিহাসিক পরিবর্তনই হোক না কেন। এই মূল হিন্দু সুরটি নষ্ট হলে ভারতের আত্মিক মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী এবং সেক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দের মতে মানবজাতির মহৎগুণগুলির মৃত্যু হবে এবং তখন পৃথিবীতে রাজত্ব করবে কাম, লোভ ইত্যাদি অপগুণগুলি। শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন, ভারত যে উত্থিত হচ্ছে তা প্রতিবেশীর কণ্ঠ পদপিষ্ট করার জন্য নয়; পরন্তু তার কাছে যে আলোক রক্ষিত আছে তা সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দেবার জন্য। ভারতের সনাতন হিন্দু রূপটিকে সযত্নে রক্ষা করতে হবে সমস্ত বাহ্যিক পরিবর্তনের আঘাত হতে।

KOTILYA CONSULTANTS LIMITED

CIN : U67120WB1983PLC036095
B. K. Market, 1st Floor
16B, Shakespeare Sarani
Kolkata - 700 071
Phone : 033-2282-0068/0161

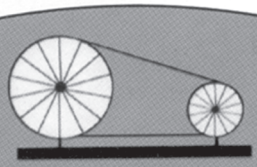

সাবধান নকল তালমিছরি কিনে ঠকবেন না
স্বদেশী আন্দোলনের যুগেও
বাংলার ঘরে ঘরে ছিল
বিশ্বস্ত একটাই নাম
চির পরিচিত
দুলালের ®
তালমিছরি
Regd. Trade Mark
দুলালের
তালমিছরি
আজও তার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ বাংলার প্রতিটি ঘরেই।
সাধারণ অল্প সর্দি - কাশিতে দুলালের তালমিছরি চুষে
খাওয়াই যথেষ্ট। আর সর্দি - কাশি বেশী হলে একটা
লবঙ্গ ও একটু আদা সহ দুলালের তালমিছরি
এক সঙ্গে ফুটিয়ে চায়ের মতন দু' বার খান
--- দারুণ কাজ দেবে।
ভারত সরকারের
R
® চিহ্ন দেখে তবেই কিনুন
দুলালের তালমিছরি — সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী
দুলালের তালমিছরি ৪, দত্তপাড়া লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৬, ফোন - ২২১৮ ৫৬৭৩, ২২১৮ ০৫৪৩